হাত বাড়ালেই

সুবিধা

Suvida

বর্ষ ২ সংখ্যা ৭
অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২

ফেসবুকে suvidapatrika আর
টুইটারে লগ অন করুন
suvidamagazine লিখে

দাম মাত্র দশ টাকা

পুজোয় চাই নতুন মজা

পাঁচটি গল্প

সমরেশ মজুমদার
রূপক সাহা
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
প্রচেত গুপ্ত
প্রীতিকণা পালরায়

এবার পুজোর শাড়ি ফ্যাশন
হ্যালো ব্যাংকক : পায়েল সরকার
সেলিব্রিটি : পুজোর হেঁশেল

দুঃশ্চিন্তা কেন হবে অন্তরায়?

উত্তর আছে শেষ মলাটের ভিতরের পাতায়

সম্পাদক
সুদেষ্ণা রায়
মূল উপদেষ্টা
মাসুদ হক
সহকারী সম্পাদক
প্রীতিকণা পালরায়
শিল্প উপদেষ্টা
অন্তরা দে
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
সুনীল কুমার আগরওয়াল
মূল্য
১০ টাকা

আমাদের ঠিকানা
এসক্যাগ ফার্মা প্রা. লি.
পি ১৯২, লেকটাউন,
তৃতীয় তল, ব্লক - বি
কলকাতা ৭০০০৮৯
email-eskagsuvida@gmail.com

প্রচ্ছদ মডেল : অদিতি চ্যাটার্জি
ছবি : আশিস সাহা

Printed & Published by
Sunil Kumar Agarwal
Printed at
Satyajug Employees' Cooperative Industrial Society Ltd.
13,13/1A, Prafulla Sarkar Street,
Kolkata-700 072
RNI NO : WBBEN/2011/39356

সূচিপত্র

চিঠিপত্তর	:	৪
শব্দজব্দ	:	৪
সম্পাদকীয়	:	৫
কথা ও কাহিনি-১	:	৬
হেঁশেল	:	১৪
কথা ও কাহিনি-২	:	১৭
বিশেষ রচনা	:	২৪
পোশাকি বাহার	:	২৬
তুমি মা	:	২৮
কথা ও কাহিনি-৩	:	৩১
ডাক্তারের চেম্বার থেকে	:	৩৭
কথা ও কাহিনি-৪	:	৪০
কাছে দূরে	:	৪৪
কথা ও কাহিনি-৫	:	৪৬
ভূতভবিষ্যৎ	:	৫০

পুজোয় শিশুকে সুস্থ রাখুন

তুমি মা

২৮

কাছে দূরে

৪৪

হ্যালো ব্যাংকক !

পাঁচ ৫টি ভিন্ন স্বাদের গল্প

কথা ও কাহিনি

পোশাকি বাহার

২৬ পুজোয় পুজোর শাড়ি

২২

হেঁশেল

সেলিব্রিটির পুজোর রান্না

১৪

চি ঠি প ত্র

প্রকৃত মা

'মা হওয়া কি মুখের কথা?' শীর্ষক প্রচ্ছদ নিবন্ধের (সুবিধা, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ২০১২) সূত্র ধরে বলাই যায়— মা হওয়া সহজ কথা নয়। সাধারণভাবে একজন নারী সন্তানের জন্ম দিলেই মা হয়ে যান, কিন্তু একজন মা প্রকৃত অর্থে মা হয়ে ওঠেন তখনই যখন তিনি তাঁর সন্তানকে মানুষ হয়ে ওঠার আদর্শ শিক্ষা দিতে পারেন। আমরা জানি, সন্তানের প্রথম শিক্ষক হলেন মা। আর এই শিক্ষক হয়ে ওঠা কিন্তু সহজ কাজ নয়। শিক্ষক তো অনেক আছেন—কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষক ক'জন? তেমনই, সন্তানের জন্ম দেওয়া মাও তো অনেক আছেন, কিন্তু যাঁরা সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম, তারা কি মা হওয়ার যোগ্য?

এখন সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সব সময় পিছিয়ে পড়ার ভয়। সন্তান যাতে পিছিয়ে না পড়ে, তার জন্য মায়ের কত চিন্তা। এই এগিয়ে দেবার লক্ষ্যে মা ও বাবা মিলে সন্তানের উপর এত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন যে সেই দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে সন্তান তার স্বাভাবিক বিকাশ হারিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে আর তার ফল আজ ঘরে ঘরে মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকা সন্তানের সংখ্যা কম নয়।

আমরা অনেকেই সন্তানের বাহ্যিক চাহিদা মিটিয়ে ভেবে থাকি, সন্তানের সব চাহিদা পূরণ করে দিয়েছি। সন্তান মানসিকভাবে কী চায়, সেই দিকটা উপেক্ষিতই থেকে যায়।

আসুন, ঘরে ঘরে আমাদের সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠি। আমরা যদি আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারি, সন্তান কী চায় সেটা অনুধাবন করতে পারি এবং সন্তানকে সেই দিকে পরিচালনা করতে পারি, তাহলে আমাদের সন্তান ও সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবেই।

বিজন মজুমদার, ইছাপুর, উ: ২৪ পরগনা

সার্থক নামকরণ

'সুবিধা' পত্রিকাটি হঠাৎই একদিন নজরে আসে, একজনকে পড়তে দেখে। তারপর আমিও একটা কিনে ফেলি। কিন্তু খুবই অবাক হই এত কম দাম দেখে। পত্রিকাটি পড়ে আমি খুবই উৎসুক হয়ে পড়ি 'সুবিধা'র প্রতি। কমদামে বেশি লাভ কে না চায় বলুন? আমার অবস্থা কিছুটা তাই। এছাড়াও এতে এত কিছু দেওয়া যে সত্যি সাধারণ মেয়েদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই পত্রিকা। সুতরাং একটা কথা বলতেই হয় এই পত্রিকাটির 'সুবিধা' নামকরণ যথার্থই সার্থক।

যদি গল্প পাঠাই সেটা ধারাবাহিক ভাবে ছাপাবেন কি?

প্রিয়াঙ্কা মিস্ত্রী, তেঘরিয়া

গল্প মনোনীত হলে ছাপাব। তবে এই মুহূর্তে ধারাবাহিক বা উপন্যাসের জায়গা আমাদের নেই। তাই ছোট গল্প ১৫০০-২০০০ শব্দের মধ্যে পাঠাতে পারেন। অবশ্যই কপি রেখে।

সেরা পত্রিকা

'সুবিধা' আমার গ্রামে আমি প্রথম আনি। এখন আমার গ্রামের ১৪০ জন মহিলা 'সুবিধা' নেয়। গ্রামের দিকে 'সুবিধা' প্রতি স্টলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। 'সুবিধা'তে গ্রামের জীবন নিয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি চাই যে 'সুবিধা' ম্যাগাজিনে সিনেমা জগৎ, কেরিয়ার এবং নামী ব্যক্তিত্বদের কথা থাক। 'সুবিধা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়ানো হোক, সেই সঙ্গে দামটাও অল্প বাড়ানো হোক।

আমি একজন পাঠিকা হিসাবে মনে করি যে সব দিক বিচার বিবেচনা করার পর আমার ধারণা, 'সুবিধা' ম্যাগাজিন হল ম্যাগাজিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মৌসুমী ঘোষ, অভিরামপুর, হুগলি

আপনারা অবশ্যই লেখা পাঠাতে পারেন। গল্প, কবিতা, আপনাদের তোলা ছবি, আপনাদের স্থানীয় কোনও বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা, ভ্রমণ কাহিনি। মনোনীত হলে সুবিধা-য় ছাপা হবে। তবে যা পাঠাবেন কপি রেখে পাঠাবেন। —সম্পাদক

শব্দজব্দ ৭ বর্ষা ও শরৎ শ্যামদুলাল কুণ্ডু

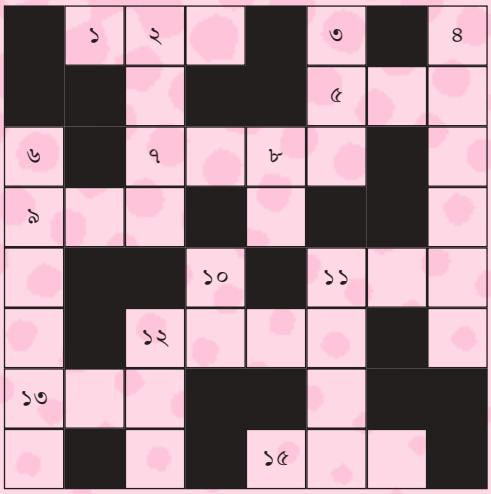

পাশাপাশি

১। দুর্গাদেবী, দুর্গার জনৈকা সখীও বটে। ৫। পত্নীর পরিচয়ে মহাদেব ৭। পিলসুজ, প্রদীপ রাখার আধার। ৯। পত্নীর সূত্রে বিষ্ণু বা নারায়ণ। ১১। শিবের এক নাম। ১২। পুজোর কদিন ধরে যারা ফুলের মালা ও অলংকার তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। ১৩। এই দেবদেবী দুর্গাকে বাণপূর্ণ তূণীর ও ধনুক দান করেন। ১৪। তৎসম শব্দে, গণেশের বাহন।

উপরনিচ

২। ভগবান, পরমেশ্বর। ৩। বিসর্জনের আগে এ খেলা সধবাদের এক হার্দিক অনুষ্ঠান। ৪। দেবী দুর্গা তো '—ধারিণী'। ৬। 'আজি—এ প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়'। ৮। নবপত্রিকা তৈরির অন্যতম উপাদান। ১০। '—বউ ; অবশ্য গণেশপত্নী নয়। ১১। শরতের চাঁদ, যা কোজাগরী পূর্ণিমায় অতীব সুন্দর। ১২। একান্নপীঠের অন্যতম, যেখানে দেবীর দক্ষিণহস্ত পতিত হয়েছিল।

সমাধান শব্দজব্দ ৭

■	বি	জ	য়া	■	সিঁ	■	দ
■	■	গ	■	■	দু	র্গে	শ
শ	■	দী	পা	ধা	র	■	প্র
র	মে	শ	■	ন	■	■	হ্
ত	■	■	ক	■	শ	ঙ্ক	র
ত	■	মা	লা	কা	র	■	ণ
প	ব	ন	■	■	দি	■	■
ন	■	স	■	ই	ন্দু	র	■

স ম্পা দ কী য়

আনন্দ উৎসব

পুরুষকার বা পৌরুষ কথাটার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত আছে পুরুষজাতির মাহাত্ম, তাদেরই বন্দনা। কিন্তু 'শক্তি' এই শব্দটি বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাতৃরূপ, মা দশভূজা। সে মাতৃরূপের মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য, রয়েছে পুরুষকার, রয়েছে মনের বল, শারীরিক সক্ষমতা। মা দশভূজা শক্তির দেবী হিসেবে আরাধ্য। তাঁর মধ্যেই রয়েছে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত গুণ। তিনি যেমন আদরের মা, বাড়ির কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে পূজিত, তেমনই তিনিই শত্রু নিধনেও অগ্রণী। তিনিই মঙ্গলদাত্রী, তাঁর মধ্যেই রয়েছে মাতৃরূপ, রয়েছে ধাত্রী রূপ, রয়েছে অশুভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষমতা, বিজয়ী হওয়ার মন্ত্রবল, অথচ তিনি নারী। মা দুর্গা। তাঁকে এবং তাঁরই আরেক রূপ মা কালীকে আমরা প্রতিবছর পূজা করি শক্তির প্রতীক হিসেবে। আর সে শক্তি শারীরিক ও মানসিক দুই-ই। মাকে এত ধুমধাম করে প্রতিবছর পূজা করলেও, প্রতিদিন কেন চোখে পড়ে মেয়েদের উপর অত্যাচার ও অনাচার? কেন আজও আমরা নারীজাতিকে মানুষের অধিকার পুরোপুরি দিতে শিখিনি? মাতৃরূপকে পূজা করি শক্তির জন্য। অর্থের দেবী লক্ষ্মীও ঘরে ঘরে পূজিত। শিক্ষাও দেন দেবী সরস্বতী। তাহলে নারীর প্রতি এত অসম্মান বাড়ছে কেন? শুধু কি তাই, আজও আমরা মেনে নিতে পারি না কন্যা সন্তানের আবির্ভাব? 'কন্যা মানে সে বোঝা'—এ ধারণা থেকে কবে আমরা মুক্তি পাব? কবে আমরা কন্যা সন্তানকে তার পূর্ণ মর্যাদা দেব? কবে আমরা মন থেকে মেনে নেব মেয়েদের শক্তি হিসেবে, গর্ব হিসেবে, প্রকৃত মানুষ হিসেবে?

মার কাছে এই পুজোয় প্রার্থনা, মা আমাদের শক্তি দাও ভুল ধ্যান ধারণা দূর করতে, নিজের মনকে গ্লানিমুক্ত করতে। মনে শক্তি দাও, যাতে মেয়েরাও পায় সমাজে তাদের সঠিক মর্যাদা ও স্থান।

সুদেষ্ণা রায়

চিঠি চাই চাই মতামত

চিঠি লিখুন, জিতুন ১০০০ টাকা

সুবিধার সপ্তম সংখ্যা এটি। এই পত্রিকার সাফল্য আপনাদের হাতে। তাই বলছি কী বন্ধু, চাই আপনাদের সহযোগিতা, পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করে তুলতে। চিঠি লিখে বা ই-মেল করে জানান এই পত্রিকার কী ভাল, কী খারাপ!

যাঁদের চিঠি আমরা আমাদের এই পত্রিকায় প্রথম চিঠি হিসেবে ছাপব তাঁদের দেওয়া হবে **হাজার টাকা উপহার**!

এ ছাড়া প্রথম ১০০টি চিঠির প্রেরককে দেওয়া হবে ৫০০টাকা করে পুরস্কার। চিঠির সঙ্গে আমাদের দেওয়া কুপনটি ভরে পাঠাবেন।

ধন্যবাদ

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক, সুবিধা
প্রযত্নে : এসক্যাগ ফার্মা প্রাঃ লি,
পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক বি
কলকাতা : ৭০০০৮৯
email : eskagsuvida@gmail.com

নাম .....বয়স.....

ঠিকানা .....

কী করেন .....দূরভাষ.....

কথাও কাহিনি ১

দোলা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলে বাবলুর অফিস বেরোনোর সময় অসীমবাবু সাধারণত নিজের ঘরে থাকার চেষ্টা করেন। সংসারে সব চেয়ে হুড়োতাড়ার পাট চলে তখন। খামোকা এঘর ওঘর ঘোরাঘুরি করলে ছেলে-বউমার ডিসটার্ব হয়। তিনি যখন চাকরিতে বেরোতেন ছেলে-মেয়ে একই কারণে দূরে দূরে থাকত।

আজ নিয়মের অন্যথা করেছেন অসীমবাবু। বাবলু অফিসের জন্য রেডি হওয়ার একটু আগে থেকেই খাবার টেবিলের একটা চেয়ারের দখল নিয়ে ছিলেন। সকালের সেকেন্ড রাউন্ড চা, খবরের কাগজ পড়া সব এই চেয়ারে বসেই হল। যা তিনি অন্য দিন নিজের ঘরে বসে সারেন। বাবলু চান-টান সেরে তাঁর উল্টোদিকে বসে ধোঁয়াওঠা ভাত ও অন্যান্য দু'একটা পদ খেল। আড় চোখে দেখছিল বাবাকে। অসীমবাবু অপেক্ষা করেছিলেন ছেলের প্রশ্নের। বাবার নিয়ম ভাঙার কারণটা বাবলু নিশ্চয়ই ঘুরিয়ে জানতে চাইবে। ঘুরিয়ে নয়, প্রায় সরাসরি জিজ্ঞেস করল বাবলু। খাওয়া দাওয়া-র পর টেবিলের পাশে এসে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে চাপা গলায় জানতে চাইল, কিছু বলবে?

চাপা গলার কারণ কথাটা যদি বাপ, ছেলের পার্সোনাল হয়, বউয়ের কানে না যাওয়াই ভাল। বউমা মিলি তখন মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর তোড়জোড় করছে।

অসীমবাবু বাবলুর প্রশ্নের উত্তরে আসল কথাটা বলে উঠতে পারলেন না। উল্টে কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, না, কিছু বলার নেই তো!

বাবলু নিশ্চিন্ত হয়ে সরে গেল সামনে থেকে। খানিকবাদে পুরোপুরি রেডি হয়ে বের হল। বউমা গিয়ে দাঁড়াল দরজায়। পাঁচিলের ছোট লোহার গেট খেলা বন্ধর আওয়াজ পাওয়া গেল। হাত নেড়ে টাটা করার ন্যাকামি ওদের মধ্যে নেই। টায়েটুয়ে চলা সংসারে ওসব বড় একটা থাকেও না।

বউমা ফিরে গেছে তিতলিকে রেডি করতে। একটু পরেই ওর স্কুলের রিক্সা আসবে।

বিফল মনোরত হয়ে খাওয়ার টেবিলেই বসে আছেন অসীমবাবু। কাপের চা শেষ, খবরও আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। সুযোগটা নিজের হাতে তৈরি করেও পারলেন না কাজে লাগাতে। কথাটা বলা হল না বাবলুকে। গতকাল থেকে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বলার। কাল রবিবার গেছে। বাবলু সকালের দিকে বাড়ি ছিল, মিউজিক সিস্টেমে রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে তিতলির সঙ্গে মেতে ছিল খুনসুটিতে। বিকেলে 'বাবা আমরা একটু বেরুচ্ছি' বলে মেয়ে বউ নিয়ে ঘুরতে গেল। ছুটির দিনগুলো ওরা এরকমভাবেই কাটায়। অতি অল্প আয়োজনে হাল্কা খুশির হাওয়া। এর মাঝে নিজের স্বার্থের কথাটা বলে বাবলুর মুডটা দমিয়ে দিতে চাননি।

সোমবার সকালেও যখন বলে উঠতে পারলেন না, সারা সপ্তাহে কথাটা আর তোলাই যাবে না। সাড়ে আটটায় এই যে ভাত খেয়ে এখন বেরোল, ফিরতে রাত আটটার কাছাকাছি। সরকারি কেরানি। অফিস সেই সল্টলেকের শেষপ্রান্তে। ট্রেনে বাসে যাতায়াতে হয়রান হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে মেয়েকে পড়াতে বসে। শনিবার হাফ ডিউটি। একটা দিনই পাড়ার ক্লাবে আড্ডাটাড্ডা মারে। একমাত্র রাতে খাওয়ার সময় বেশ কিছুক্ষণের জন্য ছেলের মুখোমুখি হন অসীমবাবু। তখন বাবলুর চেহারায় একঝুড়ি ক্লান্তি। নতুন করে কোনও দায়িত্ব চাপাতে মন চায় না। পরিস্থিতি অনুকূল থাকা সত্ত্বেও আজও কথাটা বাবলুকে না বলতে পারার কারণ, সেই একই দ্বিধা। নিজের জন্য বাবলুর কাছে দুম করে সাড়ে চার হাজার টাকা চাওয়া, ওকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বাবার মুখের ওপর না করতে পারবে না। টাকাটা জোগাড় করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ে যাবে। বাবলুর রোজগারে এখন গোটা সংসার চলে। অসীমবাবুর হাত খরচ পর্যন্ত। চাকরি থেকে অবসরের পর অসীমবাবু একটাকাও সংসারের জন্য দিতে পারেন না। কলেজ স্ট্রিটে এক পাবলিশার্সের কাছে কাজ করতেন। প্রচুর দায়িত্ব ছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি ছিল না। সঞ্চয় বলতে কিছুই করতে পারেন নি। তবে চাকরি করতে করতে সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে বাসে-র একঘণ্টা দূরত্বে দু'কাঠা জমির ওপর একতলা বাড়ি। দুই সন্তানের লেখাপড়া। ভদ্র, প্রতিষ্ঠিত পরিবারে মেয়ের বিয়ে। সরকারি চাকরির জন্য ছেলের স্পেশাল ট্রেনিং-এর খরচ। বাবলুর মেধা ভাল, কমপিটেটিভ পরীক্ষা দিয়ে চাকরিটা পেয়ে গেল। বিয়ে দিলেন ছেলের। মিলির বাড়ি থেকে এক পয়সাও নগদ নেননি। এ সবের এক বছর পর রিটায়ার করলেন চাকরি থেকে। কারও কাছে যেমন কোনও ঋণ নেই, হাতে কোনও টাকাও নেই তখন। বাবলুর চাকরিটাই সংসারের একমাত্র সম্বল। ছেলের ওপর চাপ কমাতেই বুঝি শোভনা অসীমবাবুকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে চা করতে গিয়েছিল রান্নাঘরে। জল ফুটে যাচ্ছে, শোভনা পড়ে রইল মেঝেতে। মৃত মুখটাতে তখনও লেগে আছে চা খাইয়ে না যেতে পারার কুণ্ঠা। ব্রেনস্ট্রোক। অসীমবাবুর রিটায়ারমেন্টের বয়স মোটে একমাস। সবে তখন ভাবছিলেন, কলেজস্ট্রিটে পার্টটাইম কোনও কাজ ধরবেন কি না? শোভনা চলে যাওয়াতে ইচ্ছেটাও মরে গেল। এখন ছেষট্টি, তাঁকে আর কেউ কাজে নেবে না। অনেকদিন হল বসে গেছেন। আধুনিক হয়েছে প্রকাশনার কাজ কারবার। নতুন করে সব কিছু শিখতে হবে টাকাটারও প্রয়োজন পড়াতে এখন মনে হচ্ছে, এভাবে বসে না গেলেও হত। বাবলুও বাবাকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছে। কখনও বলেনি, কাজ জানা হাত। প্রকাশনার জগতে এখনও তোমার ডিমান্ড আছে। রোজ অল্প সময়ের জন্য কোথাও ঢুকে পড়ো কলকাতা যাতায়াতে শরীরটাও সুস্থ থাকবে। ... বলতে নেই, এই বয়সে এসেও অসীমবাবু যথেষ্ট সুস্থ সবল। ব্লাড প্রেশার, সুগার কিচ্ছু নেই। কোনও দিন নেশাভাঙও করেননি। বাড়ির দোকান হাট এখনও নিজে করেন। বাবলুর দেওয়া হাত খরচের খানিকটা টাকা ওতে চলে যায়। নাতনির জন্যও এটা সেটা কিনে দেন। সংসার খরচের পুরো টাকাটাই বাবলু বাবার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল, অসীমবাবু নেননি। তাতে সংসারের সঙ্গে বড্ড বেশি জড়িয়ে থাকতে হয়। শোভনা থাকলে দায়িত্ব সাগ্রহে নিতেন। এখন আর সংসারের প্রতি সেই আসক্তি নেই। নিজেই ছেলেকে বলেছিলেন, তুই আমাকে মাস গেলে হাতে কিছু দিস। কখন কী দরকার পড়ে। সব সময় তো চাওয়া যায় না।

হাত খরচের টাকাটাও জমাতে পারেননি অসীমবাবু। সেটা যেমন সংসারের জন্য খরচা করেছেন, সারা জীবনের উপার্জন চলে গেছে এই পরিবারকে রক্ষা করতে। নিজের শখ-আহ্লাদের কথা মাথাতেই আসেনি। সংসারে যখনই বেশি টাকার প্রয়োজন পড়েছে, অফিসে ওভার টাইম করে অথবা অন্য প্রকাশনার খুচরো কাজ তুলে দিয়ে রোজগার করেছেন। এত কিছুর পর সংসার থেকে তাঁরও তো সামান্য পাওনা হয়। ছেলে যে সেটা দিত না, তা নয়। তিনি চাইতে পারলেন কই!

—বাবা, আপনাকে আর এক কাপ চা দিই?

বউমার প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরল। অপ্রতিভ হলেন অসীমবাবু। মিলি ভেবেছে চায়ের প্রত্যাশায় বসে রয়েছেন তিনি। বলে উঠলেন, না না, এখন দেওয়ার দরকার নেই। তিতলি বেরোক, তারপর দিও।

তিতিলির ভাতের থালা টেবিলে রাখল মিলি। মেয়ের উদ্দেশে হাঁক পাড়ল, আয়, চলে আয় তাড়াতাড়ি। গাড়ি এসে যাবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন অসীমবাবু।

ঘরে এসে দেখলেন সকালের রোদটা বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে পড়ে রয়েছে। এই ঘরে একটা কাঠের চেয়ার আছে, বসলেন অসীমবাবু। মেঝেয় পড়ে থাকা রোদের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল তাঁর আর এই রোদ্দুরের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। রোদটা এ বাড়িরই একজন সদস্য। নিজস্ব কোনও আকার নেই। এ ঘরের জানলাই তার আকৃতি। তবু সে আছে। কোনও চাওয়া পাওয়া নেই। উল্টে নিয়মিত এ বাড়ির উপকারে লাগছে সে। দৃশ্যমান অথচ বায়বীয় এক অস্তিত্ব। যার নিজের কোনও ভাষা নেই।

অসীমবাবুর অস্তিত্বের এই গভীর সংকটের মূলে আছে নেহাতই এক জড়বস্তু। রকিং চেয়ার। দাম সাড়ে চার হাজার টাকা, বেতের। সামান্য এরকম একটি চেয়ারে জন্য তিনি যে এতটা কাতর হয়ে পড়বেন, নিজেও ভাবেননি। বিষয়টার সূত্রপাত গত বুধবার, বিকেলের ওয়াকিং শেষে শীলপাড়া হয়ে বাড়ি ফিরছেন। রোজকার মনে একবার মণিময়বাবুর বাড়ির দিকে তাকালেন, ভদ্রলোক রোজ বারান্দায় বসেন না। শরীর ভাল থাকে না তাঁর যেদিন সুস্থ বোথ করেন, এসে বসেন ইজিচেয়ারে। ওঁকে দেখতে পেলে অসীমবাবু গিয়ে এক- আধঘণ্টা গল্প করে আসেন। অসীমবাবুরই সমবয়সী মণিময়বাবু। স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বাইরে একা বের হতে পারেন না। বাড়িতে স্ত্রী এবং সবসময়ের কাজের একটি ছেলে। এলাকার কেউ গল্প করতে এলে খুব খুশি হন মণিময়বাবু। অসীম-বাবুর মতো এক বয়সি হলে তো কথাই নেই।

বুধবার বিকেল ফুরনোর মুখে মণিময়বাবু বারান্দায় ছিলেন, দৃশ্যে সামান্য অসংগতি দেখা গেল। চেয়ারটা অন্যরকম। গ্রিলের গেট খুলে বারান্দার দিকে হেঁটে যেতে যেতে অসীমবাবু দেখলেন বেতের নতুন রকিং চেয়ারে বসে অল্প অল্প দুলছেন মণিময়বাবু। চোখে-মুখে বাড়তি খুশি খুশি ভাব! অন্যান্য দিনের মতোই আসুন আসুন বলে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন অসীমবাবুকে। অতিথিদের জন্য বারান্দায় একটা স্টিলের গার্ডেন চেয়ার রাখা থাকে। সেটাতে বসে অসীমবাবু রকিং চেয়ারটাকে নির্দেশ করে বলেছিলেন, ভালই হয়েছে জিনিসটা। নতুন কিনলেন?

—আর বলবেন না, গিন্নি কাজের ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কিনে এনেছে। কোনও দরকার ছিল না, আগেরটাই বেশ ছিল। ছেলে হঠাৎ কিছু টাকা পাঠিয়েছে। হাত সুরসুর করছে

গিন্নির। আরও অনেক কিছুই কিনছে। কে এসব ভোগ করবে বলুন তো! আমরা বুড়ো বুড়ি মরে গেলে, ছেলে জলের দরে এসব বিক্রি করে ফিরে যাবে বিদেশে।

মণিময়বাবুর লম্বা উত্তরের পর অসীমবাবু ছোট্ট প্রশ্ন করেছিলেন, কত পড়ল? প্রথমবারের কথাটা ধরতে পারেননি মণিময়বাবু। ফের একবার জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, উত্তরে মণিময়বাবু বলেছিলেন, গিন্নি তো বলল ছ'হাজার। আমার মনে হয় কমিয়ে বলেছে। পাছে বেশি রাগ করি।

এরপর আর চেয়ার নিয়ে কথা হয়নি। দুজনে চলে গিয়েছিলেন অন্য প্রসঙ্গে। রাজনীতি, বাজারদর। অসুখ-বিসুখ... অসীমবাবু লক্ষ করেছিলেন অন্য দিনের তুলনায় মণিময়বাবু বেশ ফুরফুরে আছেন। কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে অসুস্থতা ধরা পড়ত ওঁর। চেয়ারের মোলায়েম দুলুনির কারণেই কি না, কে জানে! সেই কষ্টটা একেবারেই উধাও।

আড্ডা মিনিট কুড়ির বেশি চলল না। বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন অসীমবাবু। মণিময়বাবুর মুখ থেকে চোখ চলে যাচ্ছিল রকিং চেয়ারটার দিকে। বাড়ির কাজের অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়েছিলেন তাড়াতাড়ি। ফেরার পথে পেন্ডুলামের মতো মণিময়বাবুর চেয়ারটা দুলতে থাকল মাথায়। খালি মনে হতে লাগল আমার যদি ওরকম একটা হত। সারাজীবন কষ্ট করার পর ওই আয়েশটুকু অবশ্যই বড় প্রাপ্তি। চেয়ারটার দুলুনিতে বেশ অভিজাত, জমিদার জমিদার ভাব আছে। সেই হিসেবে দাম মোটেই বেশি নয়। অসীমবাবুর পক্ষে অবশ্য অনেক। মণিময়বাবুর গিন্নি যদি কমিয়ে বলে থাকেন, তাহলে তো ও নিয়ে ভাবাই সার।

পরদিন মাথা থেকে দুলুনিটা গেল না। বিকেলের দিকে অসীমবাবু গেলেন স্টেশন বাজারে। ওখানে পর পর তিনটে ফার্নিচারের দোকান আছে। একটাতে বেতের জিনিস রাখে। সেখানেই দেখলেন মণিময়বাবুর মতো চেয়ার। স্ত্রী দাম কমিয়ে বলেননি। আর এক রকম কোয়ালিটি দেখা গেল, একটু হাল্কা পলকা। কারুকাজ কম। দামও কম, সাড়ে চার হাজার। কাজ চলে যাবে অসীমবাবুর। কিন্তু ওই টাকাটাই বা পাবেন কোথা থেকে? এদিকে দুর্নিবার আকর্ষণ তৈরি হয়েছে জিনিসটার প্রতি। কেন এত টান বুঝতে পারছেন না। তাঁর ছোটবেলায় এক ধরনের কাঠের ঘোড়ার খুব চল ছিল। পায়ের নিচটা রকিং চেয়ারের মতো, ঘোড়ার পিঠে বসে দোল খাওয়া যেত। খেলনাটা তাঁদের মতো গরীব পরিবারের ছেলেদের থাকার কথা নয়, তাঁরও ছিল না। উপহার হিসেবেও কেউ দেয়নি। যে সব বন্ধু অবস্থাপন্ন পরিবারের, তাদের ছিল। এই বয়সে এসে অসীমবাবুর আর মনে পড়ে না ছোটবেলায় ওই ঘোড়ায় তাঁর চড়া হয়েছিল কি না? হয়তো চড়তে দেয়নি বড়লোক ঘরের কোনও বন্ধু। অভিলাষটা এখনও রয়ে গেছে মনে। সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া হয়নি তাঁর। বঞ্চিত রয়ে গেছেন। সমস্ত না পাওয়ার একটাই সান্ত্বনা, ওই রকিং চেয়ার। ওটা পেলেই যেন জীবনের প্রতি আর কোনও অনুযোগ থাকবে না অসীমবাবুর। এ বাড়ির সদর দরজার পর একফালি বারান্দা আছে, সেখানে চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে জীবন দেবতার দেওয়া সমস্ত দুঃখকষ্টটাকে ভুলে যাবেন। —দাদু আসছি। টাটা।

তিতলির ডাকে চিন্তা-প্রবাহ থমকায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকান অসীমবাবু, ততক্ষণে তিতলি সরে গেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন। রোদটা এখন তাঁর কোলে। ঘরের কোণে আলমারির গায়ে চোখ যায়, ওটা খুলে কত সময়, কতবার টাকা বার করেছেন। মেয়ের বিয়ে, ছেলের বিয়ে, পুজোর বাজার, বাড়ি রিপেয়ারিং... এখন ওখানে সাকুল্যে হয়তো দুশো আড়াইশো পড়ে আছে।

—বাবা, চা দিচ্ছি আপনাকে। তিতলিকে স্কুল ভ্যানে তুলে দিয়ে রান্নাঘরে ফেরার সময় বলে গেল মিলি।

চা এখন মোটেই খেতে ইচ্ছে করছে না অসীমবাবুর। বউমার উদ্দেশে গলা তুলে বললেন, এখন আর দিয়ো না। একটু পরে তো জল খাবার দেবে, তখনই দিয়ো। —আচ্ছা রান্নাঘর থেকে ভেসে এল মিলির গলা।

ফের আলমারির দিকে তাকান অসীমবাবু। বন্যার্ত মানুষ যে দৃষ্টিতে নিজের ভাঙা বাসার দিকে তাকায়। ছেলে, মেয়ের বিয়ের পর শোভনার গয়না খুব সামান্যই ছিল। ও চলে যাওয়ার এক বছর কাটতে না কাটতেই অসীমবাবু এই আলমারির লকার থেকে গয়নাগুলো বার করে বিক্রি করেন। বাবলুর ঘরে অ্যাটাচড বাথ বানিয়ে দেন সেই টাকায়। প্রাইভেসির এই ব্যবস্থায় খুশি হয়েছিল ছেলে-বউমা। শোভনার হয়ে সংসারের জন্য এই কন্ট্রিবিউশন করতে পেরে ভাল লেগেছিল অসীমবাবুরও। মরে যাওয়ার পরই মানুষ শেষ হয়ে যায় না। তারপরও দেওয়ার থাকে। এখন অসীমবাবুর মনে হচ্ছে, পুরো টাকা খরচ না করলেই পারতেন। কিছু রাখা থাকলে আজ চেয়ারটা কেনা নিয়ে এত চিন্তা করতে হত না। কিছু কি আছে লকারে, নাকছাবি, পাতলা আংটি, পাঞ্জাবির কোনও একটা বোতাম? হয়তো লকারের একদম কোনায় রয়ে গেছে, হাত পৌঁছয়নি অসীমবাবুর। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। একবার চেক করতে ক্ষতি কি?

কিছুই পাওয়া গেল না। লকারে শুধুই দরকারি কিছু কাগজপত্র। সে সব নামিয়ে কোনায় টর্চ মেরে পর্যন্ত দেখলেন। হতাশ হয়ে কাগজগুলো ফের লকারে তুলে চাবি মারার পর চোখ গেল আলমারির নীচে দু'নম্বর তাকে, উঁকি মারছে শোভনার লাল বেনারসি। শাড়িটা যেন দপ করে আলো হয়ে জ্বলে উঠল।

তেজালো দুপুর। রোদের ঝাঁঝে কলকাতা যেন ঝিমোচ্ছে। কাঁধে সুতির সাইড ব্যাগ, অর্ডিনারি প্যান্ট শার্ট পরা অসীমবাবু বৈঠকখানা বাজার ধরে হাঁটছেন। যখন চাকরি করতেন, শিয়ালদা থেকে পায়ে হেঁটে এই রাস্তা দিয়েই আসতেন কলেজস্ট্রিটে। শর্টকার্ট হয়। বাসের খরচা বাঁচে।

অসীমবাবুর কাঁধ ব্যাগে এখন শোভনার বেনারসি। সেই কবেকার শাড়ি। শোভনারও শাড়ি নয় এটা, ওর ঠাকুমার। এই বেনারসিটা পরে বিয়েতে বসেছিল শোভনা। আজ সকালে আলমারি বন্ধ করার আগে বেনারসিটাতে যে উজ্জ্বল আলো দেখেছিলেন অসীমবাবু, তা আসলে আশার আলো। একই সঙ্গে এই শাড়িটাই মনে করিয়ে দিয়েছিল বেদনাবিধুর কিছু স্মৃতি, যা তিনি প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। বাড়ির লোক সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল, শোভনা, অসীমবাবুর। বিয়ের আগে শোভনাকে দেখতে যাননি। লাইফে তখন প্রচণ্ড স্ট্রাগল। পাত্রী দেখার মুড ছিল না। ছবি দেখানো হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, খারাপ কী! বিয়েতে রাজি হয়ে যান অসীমবাবু। মায়ের শরীরের কারণেই বিয়ে করা। একা সংসারের ঝক্কি সামলাতে পারছিল না মা। অবিবাহিত কাকা, অসীমবাবু-রা চার ভাইবোন, বাবা, মা নিয়ে ভরা সংসার। অসীমবাবু বাড়ির বড় ছেলে, দায়-দায়িত্ব ধীরে ধীরে তাঁর ওপর বর্তাবে প্রথমে। এমনটাই প্রথা।

বিয়ের দিন শোভনাকে দেখে ছবির থেকেও ভাল লেগেছিল, রোগার দিকে গড়ন, মিষ্টি মুখশ্রী রং একটু মাজা। চোখেমুখে কীরকম যেন ভয় সংকোচের ভাব। লজ্জা কিন্তু নয়। খটকা লেগেছিল অসীমবাবুর। ধন্ধটা ক্লিয়ার হয়ে গেল বিয়ের পিঁড়িতে বসা অবস্থাতেই। তখন মঙ্গলঘটের ওপর দুজনের হাতে হাত। মন্ত্র পড়ছেন পুরোহিত মশাই। সম্ভবত সেজপিসি নাকি তার মেয়ে

কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, কালোমেয়েটাকে সস্তায় পার করে দিল। গয়নার ছিরি দেখেছিস, দু-চারটে যা দিয়েছে সবই ফঙফঙে, ঠুনকো।

বউয়ের সঙ্গে যে গয়নাও দেখে নিতে হয়, এই মানসিকতা ছিল না অসীমবাবুর। মন্তব্যটাকে গুরুত্ব দেননি। বউ নিয়ে বাড়ি আসার মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন বিষয়টা কত গুরুতর। শোভনাকে নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে গিয়েছিল মেয়ে মহলে। ছেলেদের মধ্যেও চাড়াল ব্যাপারটা। বাবা আত্মীয়দের ম্যানেজ করার একটা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বলছিলেন, ওরা যা দিয়েছে বলেই দিয়েছে, ঠকায়নি। আমি জেনে বুঝে গরীব ঘরের মেয়েকে পুত্রবধু করেছি...

এ সব আলোচনা একেবারেই নাক গলাতে চাননি অসীমবাবু। রুচিতে বাধছিল। উদাসীন থাকার চেষ্টা করছিলেন।

শ্বশুরবাড়িতে পা রাখার সময় অত্যন্ত দায়সারা ভাবে বরণ করা হল শোভনাকে। একদিন বাদেই এ বাড়িতে লোক খাওয়ানো, তার জোগার যন্ত্রের ফাঁকে অসীমবাবু লক্ষ করছিলেন শোভনাকে খানিকটা একা করে দেওয়া হয়েছে। খুব দরকার ছাড়া পাশে কেউ যাচ্ছে না। তিনি যদি সঙ্গ দিতে যান, দৃষ্টিকটু লাগবে। বউ-হ্যাংলা বলবে আত্মীয়রা।

উপেক্ষাটা কালরাত্রি পেরিয়ে ফুলশয্যার ঘর অবধি চলল। শোভনাকে যা হোক তা হোক করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দোতলায় অসীমবাবুর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। তখন অসীমবাবুরা সালকিয়ার বাড়িতে থাকতেন। শরিকি বাড়ি। অনেক পরে অসীমবাবু সোদপুরে এখনকার বাড়িটা করেন।

সে যাইহোক ফুলশয্যার রাতে ঠাট্টা ইয়ারকি করার মতো ভাইবোন, মাসিপিসি কেউ ছিল না আশে পাশে। অসীমবাবু একা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন, শোভনা নিশ্চয়ই ভীষণ মনখারাপ করে বসে আছে। মেয়েটার মনে ভরসা দিতে হবে।

তার দরকার পড়ল না। ফুলশয্যার ঘরে পা রেখে অসীমবাবু দেখলেন, কৃপণের মতো ফুল ছেটানো বিছানায় দরজার দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি রেখে বসে আছে শোভনা। চোখে মুখে অপরিচয়ের আড়ষ্ঠতা, নতুন বউয়ের ছদ্ম লজ্জা, কিচ্ছু নেই।

দরজার ছিটকিনি তুলে অসীমবাবু ঘুরে দাঁড়াতেই বিছানা থেকে নেমে এসেছিল শোভনা। দুজনেই খানিকটা করে এগিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা কথা যে ভাবে তড়বড় করে বলে মানুষ, শোভনা শুরু করেছিল তেমনই, বাড়ি থেকে বেশি গয়না দিতে পারেনি বলে তুমিও নিশ্চয়ই রাগ করেছ? অসীমবাবু বলেছিলেন, আমি তো আর গয়নাকে বিয়ে করতে যাইনি, খামোকা রাগ করতে যাব কেন! তাছাড়া সোনা গয়নার ব্যাপারে আমি তেমন বুঝিও না, কোনও আগ্রহও নেই।

—সে তোমায় আমি দেখেই বুঝেছি। তবে একটা কথা বলি, সোনা আরও কিছু আমি নিয়ে এসেছি।

—মানে! ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠেছিলেন অসীমবাবু।

শোভনা বলেছিল, ও বাড়ির যে বেনারসিটা পরে আমি বিয়েতে বসেছিলাম, ওতে সোনা আছে। আমার ঠাকুমার শাড়ি। জমিদারের নায়েব ছিল ঠাকুমার বাবা। কৃষ্ণনগরের জমিদার বেনারসিটা দিয়েছিল উপহার হিসেবে। ঠাকুমা ঠিকই করে রেখেছিল ওটা নাতনির বিয়েতে দেবে।

বলার পর দম নিয়েছিল শোভনা। ঘুরে গিয়ে বিছানার দিকে এগোতে এগোতে বলেছিল, আগেকার দিনে দামি বেনারসিতে জরির সঙ্গে সোনা মেশানো থাকত, জানো তো?

—শুনেছি। বলেছিলেন অসীমবাবু।

শোভনা বলেছিল, হয়তো দেখেওছ, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমারটাও তো দেখলে, পুরনো হয়েছে, কিন্তু অনেক দামি। আমি তোমাদের বাড়ির লোককে বলতেই পারতাম কথাটা। বলিনি, তাহলেই শাড়িটা দেখার হিড়িক পড়ে যেত। এ হাত ও হাত। কেউ বিশ্বাস করত, কেউ বা নয়। ঠাকুমার দেওয়া জিনিসটা নষ্ট হত।

দুজনে গিয়ে বসেছিলেন বিছানায়। শাড়ি, গয়নার প্রসঙ্গ এড়িয়ে নতুন বউয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলেন অসীমবাবু। এতই টায়ার্ড ছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি।

অসীমববুর অস্তিত্বের এই গভীর সংকটের মূলে আছে নেহাতই এক জড়বস্তু। রকিং চেয়ার। দাম সাড়ে চার হাজার টাকা, বেতের। সামান্য এরকম একটি চেয়ারের জন্য তিনি যে এতটা কাতর হয়ে পড়বেন, নিজেও ভাবেননি।

পরেরদিন থেকে বাইরের আত্মীয়রা যে যার বাড়ি ফিরতে লাগল। 'কম গয়না' নিয়ে অসন্তোষ অন্তর্হিত হল অনেকটা। বাকি যতটুকু ছিল, শোভনা সুন্দর ব্যবহারে, কর্মনিপুণতায় কিছুদিনের মধ্যেই মুছে দিতে সমর্থ হল।

তারপর তো নানা ঘটনা, অধ্যায় যোগ হতে থাকল জীবনে। দুই সন্তান একে একে এল পৃথিবীতে। তাদের বড় করা, সালকিয়ার বাড়ি ছেড়ে সোদপুরে উঠে আসা... ঠাকুমার বেনারসিটা উৎসব অনুষ্ঠানে কখনও সখনও পরেছে শোভনা, ওতে সোনা থাকার কথা খেয়ালই পড়েনি অসীমবাবুর। আজ পড়ল। আশার আলো হয়ে উঠেছিল শাড়িটা। এটা বিক্রি করলে রকিং চেয়ার কেনার টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সোনার যা দাম এখন। বেনারসিটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু বাধো বাধো ঠেকেনি। শোভনা নেই, এই শাড়ির আর কী মূল্য আছে? এতে যে সোনা মেশানো আছে, জানেন একমাত্র অসীমবাবু। নিজের স্ত্রীর সম্পত্তিতে আয়েস করবেন, তাতে তো অন্যায় কিছু নেই।

... ভাবনার এই পর্যায়ে এসে অসীমবাবু আবিষ্কার করেন কেন বাবলুর কাছে টাকা চাইতে তার কুণ্ঠা হচ্ছে। এ তো ছেলের সঙ্গে একধরনের সওদা। তোমাকে মানুষ করেছি, এবার তুমি আমাকে দাও। যদি দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ থাকত বাবলুর,

চাইতে অস্বস্তি হত না।

দুপুরে চান খাওয়া করে শোভনার শাড়িটা সাইড ব্যাগে নিয়ে মিলিকে বলেছিলেন, কলকাতা যাচ্ছি। ফিরতে সন্ধে হবে।

—হঠাৎ! কী কাজে বাবা? জানতে চেয়েছিল বৌমা। অসীমবাবু বলেছিলেন, সেরকম কিছু না। ঘুরে আসি। নিজের অফিস পাড়াটা। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। পুরনো লোকদের সঙ্গে দেখা হবে।

পুরনো অফিস পাড়াতেই চলেছেন অসীমবাবু। কারওর সঙ্গে দেখা করতে নয়, শাড়িটা বেচতে। এই পাড়ায় যখন ঘোরাঘুরি করতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে যেতেই পরপর কটা শাড়ির দোকান পড়ত। বড় সাইন বোর্ডে লেখা তাদের নাম। ছোট বোর্ড থাকত দোকানের গা লাগোয়া, এখানে পুরনো বেনারসি শাড়ি কেনা হয়।' ফুটপাথ ধরে যেতে যেতে চাকরির গোড়ার দিকে কোনও এক কলিগকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পুরনো বেনারসি নিয়ে কী করে এরা?

কলিগ বলেছিল, বেনারসি শাড়ির প্রায় সব কিছুই নতুন বেনারসি বানাতে কাজে লাগে। সুতো, জরি সব। আগেকার বেনারসির কোয়ালিটি ছিল দুর্দান্ত। সেই দাম তো এরা দেয় না। খানদানি বেনারসিতে জরির সঙ্গে সোনার সুতোও থাকত। সেইসব শাড়ি পেলে এরা লুফে নেবে। কতটা সোনা আছে বোঝার ক্ষমতা নেই বেচতে আসা লোকের। এরা বুঝতে পারে, দাম দেয় ইচ্ছে মতো। শোভনার ঠাকুমার বেনারসি কতটা খানদানি জানেন না অসীমবাবু। সোনা আছে জানেন।

এই গলি দিয়ে বেরোলেই আমহার্স্ট স্ট্রিটে গিয়ে পড়বেন। দোকানগুলো আছে তো? বিয়েতে এখনও যখন বেনারসি পরার চল আছে দোকানও থাকবে।

আছে। ঠিক আগের মতোই। দোকানগুলোর সাজসজ্জা এতটুকু বদল হয়নি। মাঝে যে ছ-সাত বছর কেটে গেছে বোঝার উপায় নেই। ফুটপাথে হকারও বাড়েনি মনে হচ্ছে। রাস্তা ক্রস করে চারটে দোকানের একটাকে বেছে নিলেন অসীমবাবু। এই মুহূর্তে দোকানটায় কোনও কাস্টমার নেই। বউয়ের শাড়ি বেচে দেওয়ার দৃশ্যটা কারোর না দেখাই ভাল।

কাউন্টার নয়, গদি পাতা সাবেকি দোকান। পিছনে প্রায় ছাদ ছোঁয়া আলমারি ভর্তি শাড়ি। গেটের মুখে চটি ছেড়ে দোকানে ঢুকলেন অসীমবাবু। পিঠ সোজা করে বাবু হয়ে বসা তিন বিক্রেতা নড়ে চড়ে বসল। ধুতি, শার্টের কলার দেওয়া পাঞ্জাবি পরিহিত মাঝের জন নিশ্চয়ই মালিক। পাশে কাঠের বড় ক্যাশবাক্স। উনিই বললেন, বলুন কী দেব?

গদিতে গুছিয়ে বসলেন অসীমবাবু। অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় (পাছে চোরাই মাল না ভাবে) শুরু করলেন, আমার কাছে জমিদার আমলের একটা বেনারসি আছে। আমার স্ত্রীর ঠাকুরমার। বিক্রি করতে চাই। জরির সঙ্গে সোনাও আছে। —দেখি বলে হাত বাড়ালেন দোকান মালিক। কতটা উৎসাহিত হয়েছেন বোঝা গেল না।

সাইড ব্যাগের চেন খুলে শাড়িটা বার করে দোকানদারের হাতে দিলেন অসীমবাবু। দুপাশের কর্মচারী দুজন ঝুঁকে পড়ল শাড়িটার ওপর। মালিক মন দিয়ে পরখ করতে লাগলেন শাড়িটা। পিছনে আলমারির নীচের ড্রয়ার থেকে বার করলেন আতস কাচ।

পাট করা বেনারসিটা খুলে ফেলছেন ধীরে ধীরে। আতস কাচ চোখের সামনে রেখে দেখছেন জরির কাজ, রেশমের কোয়ালিটি।

আচমকাই একটা জোরদার উৎকণ্ঠা চাড়িয়ে গেল অসীমবাবুর শরীরে। কিসের টেনশন ঠিক বুঝতে পারছেন না। নানা রকম কথা আসছে মাথায়, লোকটা কি ঠকাবে? হয়তো অনেক সোনা আছে, দেবে অল্প টাকা। অথবা এত বেশি টাকা দিল, যা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। এমনও হতে পারে, দিল দু আড়াই হাজার টাকা। তাতে না হবে রকিং চেয়ার, শাড়িটা চলে যাবে চোখের বাইরে। গেলে ক্ষতি কি? শাড়িটা তো মনের বাইরে অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছিল, প্রয়োজন পড়েছে বলেই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ওতে স্মৃতির কোনও সুবাস নেই। আলমারি থেকে বার করার সময় পেয়েছিলেন ন্যাপথলিনের গন্ধ। —আমি একবার ভেতরে গিয়ে শাড়িটা দেখি। কথাটা বলে শাড়ি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন মালিক।

অসীমবাবু কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। চুপ থাকাটা সম্মতি ধরে নিয়ে মালিক দুটো আলমারির মাঝখান দিয়ে চলে গেল কোথায়, কে জানে।

উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল আরও কয়েক ধাপ। ফিরবে তো লোকটা? শাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যাবে না তো? কোনওভাবে কি সোনা খুলে নিচ্ছে... ভাবতে ভাবতেই বুঝতে পারছেন, অবান্তর ভাবনা। টেনশন থেকে হচ্ছে এরকম।

শাড়ি হাতে ফিরে এসেছেন মালিক। অভিব্যক্তিহীন মুখ। যেন ডাক্তার। এই মাত্র বেরোলেন অপারেশন থিয়েটার থেকে। রোগীর অবস্থা জানাবেন। আগের জায়গায় এসে বসলেন দোকান মালিক। নীচের ঠোঁট উল্টে, মাথা নেড়ে বললেন, সোনাটোনা কিছু নেই। তবে সুতো, জরির কোয়ালিটি ভাল। পুরনো দিনের জিনিস বলে কথা। পাঁচশো দিতে পারি।

মালিকের বলা শেষ হতেই শাড়িটার দিকে হাত বাড়ালনে অসীমবাবু। অর্থাৎ ফেরত চান।

বেনারসিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে মালিক বলল, সোনা কিন্তু সত্যিই নেই। আপনি যে কোনও দোকানে দেখাতে পারেন। আপনার মতো ভদ্রলোক বিক্রি করতে এসেছেন বলেই আমি ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সোনা যে নেই, হাতে নিয়েই মনে হয়েছিল আমার।

অসীমবাবু শাড়িটা নিয়ে ব্যাগে পুরছেন, এখন আর ন্যাপথলিনের গন্ধ পাচ্ছে না। পাচ্ছেন শোভনার সুবাস। সেটা শাড়ি থেকে নাকি স্মৃতি বেয়ে আসছে, ঠিক ঠাওর করতে পারছেন না।

উঠে দাঁড়িয়েছেন অসীমবাবু। হাতজোড় করে দোকান মালিকের উদ্দেশে নমস্কার জানালেন। সৌজন্য অগ্রাহ্য করে মালিক বলে উঠলেন, দেখুন বড়জোর সাতশো দিতে পারি। খামোকা অন্য দোকানে ঘুরবেন কেন?

ভদ্রতার হাসি হেসে দোকান থেকে নেমে চটি জোড়া পরলেন অসীমবাবু। অন্য কোনও দোকানে গেলেন না। ফুটপাথ পেরিয়ে সোজা রাস্তায়। উৎকণ্ঠার এখন আর কোনও রেশ নেই শরীরে। চাপ হয়ে থাকা বুকটা বেশ হাল্কা লাগছে। ঠাণ্ডা মাথায় ক্রস করছেন রাস্তা। এতটাই সাবধানে যেন কাঁধ ব্যাগে শোভনার শাড়ি নয়, শোভনাকে নিয়েই পার হচ্ছেন পথ।

বৈঠকখানা বাজারের মুখে খুব ভাল করে তেলেভাজা ভাজে। অফিস ফেরার পথে খেতেন। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো খেলেন। এই বয়সে একটার বেশি খাওয়া উচিত নয়, দ্বিতীয়টা বোধহয় শোভনার হয়ে খেলেন। তারপর মিশে গেলেন শিয়ালদা স্টেশনগামী যাত্রীদের ভিড়ে।

সন্ধে উতরে গেছে অনেকক্ষণ। অসীমবাবু ঢুকলেন পাড়ায়। বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিন্তা করছে দেরিটা হল মণিময়বাবুর বাড়ি ঘুরে আসতে গিয়ে। আলো থাকতেই নেমেছিলেন নিজেদের স্টেশনে। মনে হল, যাই একবার মণিময়বাবুর কাছে। সঙ্গ দিয়ে আসি। মানুষটা কথা বলার লোক পায় না। স্ত্রীর সঙ্গে কতইবা বক বক করবেন। প্রতিষ্ঠিত ছেলে বিদেশ থেকে যতই টাকা পাঠাক, নিঃসঙ্গতা তা দিয়ে কাটে না।

আজ গল্প বেশ জমে উঠেছিল। কখন যে এতটা সময় পার হয়ে গেছে, খেয়ালই পড়েনি। মণিময়বাবুর রকিং চেয়ারটায় অনেকটা সময় ধরে দুলেছেন অসীমবাবু। নিজেই মণিময়বাবুকে বলেছিলেন, উঠুন তো মশাই, দেখি চেয়ারটায় বসে কেমন লাগে।

সাগ্রহে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে মণিময়বাবু বলেছিলেন, আরেঃ, এ আর বলার কী আছে! বসুন না, যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন।

পাশে স্টিলের গার্ডেন চেয়ারে বসলেন মণিময়বাবু। বেতের রকিং চেয়ারে দুলতে বড়ই আরাম হচ্ছিল অসীমবাবুর। আড্ডাটা তাই লম্বা হয়ে গেল। বেশ একটা হাওয়াও দিচ্ছে আজ সন্ধে থেকে।

মোড় ঘুরতেই নিজের বাড়িটা দেখতে পেলেন অসীমবাবু। বিষম সংকোচে গুটিয়ে গেলেন ভেতর ভেতর। বারান্দার আলো জ্বলছে, পায়চারি করছে বাবলু। টেনশন হচ্ছে বাবার জন্য।

অসীমবাবু পাঁচিলের গেট খুলছেন মাথা নিচু করে, যতটা সম্ভব নিজকে সংযত রেখে বাবলু বলে ওঠে, সেই কখন বেরিয়েছ। কোথাও থেকে তো একটা ফোন করবে। চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি আমরা।

বাবলুর পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে অসীমবাবু বললেন, এতদিন পরে দেখা, পুরনো বন্ধুরা কিছুতেই ছাড়ছিল না।

বাথরুমে মুখ, হাত-পা ধুয়ে ঘরে এলেন অসীমবাবু। ব্যাগ থেকে শোভনার শাড়িটা বার করে তুলে রাখলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। চল্লিশ বছর আগে ফুলশয্যার ঘরের দরজা লাগানোর মতোই আলমারির পাল্লা দুটো বন্ধ করলেন।

—বাবা, মুড়িটুড়ি কিছু খাবেন? ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল মিলি।

অসীমবাবু বললেন, না, শুধু চা দাও। বারান্দায় দাও। আমি চেয়ারটা নিয়ে যাচ্ছি।

—বারান্দায় কেন?

—আজ বেশ হাওয়া আছে বাইরে।

মিলির থেকে বাবার ইচ্ছে শুনে বাবলু চেয়ারটা এনে রেখেছে বারান্দায়। অসীমবাবু এসে বসলেন। খালি গায়ে পরণে পাজামা পরা বাবলু বসেছে চেয়ারের পাশে বারান্দার মেঝেতে। নিজের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলছে, বেশ ভালই হাওয়া লাগছে। অফিস থেকে ফিরে মাঝে মধ্যে বসতে হবে এখানে। আজকাল তো বসাই হয় না বারান্দায়।

মিলি চা নিয়ে এল। থালা থেকে কাপ তুলে দিল অসীমবাবু আর বাবলুকে। থালা মেঝেতে নামিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে ঠেসান দিল বারান্দার থামে। সামনে কোনও বাড়ির গার্ড নেই। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ।

তিতলিটা কোথা থেকে ছুটে এসে দাদুর দুপায়ের মাঝে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। অসীমবাবু চায়ের কাপে চুমুক মারতেই টের পেলেন চারপেয়ে পুরনো কাঠের চেয়ারটা দুলছে। চমকে ওঠার মতো দোলা নয়, অত্যন্ত ধীর লয়ে। অলক্ষের দুলুনিটা অনুভূত হচ্ছে মনের গভীরে। অনেকটা পৃথিবীর ঘূর্ণনের মতো। ওপর থেকে সহজে মালুম হয় না।

উত্তর কলকাতায় প্রথম
কিডনির অসুখে উন্নত প্রযুক্তিগত
লেজার সার্জারি

LASER SURGERY
HOLMIUM

@Eskag SANJEEVANI Bagbazar

	TURP	LASER
1 Invasiveness	Minimum	Minimum
2 Post operative Pain	Minimum Pain	Painless
3 Energy used	Electric	Laser beam
4 Hospital Stay	More	Less
5 Resume normal Activities	Late	Early
6 Blood Loss	Yes	Negligible
7 Sexual side effect	Present	Nil
8 Anticoagulant taking Pt	Need to stop	No need to stop
9 Normal saline resection	Not possible	Possible

২৪x৭ দিন একই ছাদের তলায় পাবেন
সবরকম আধুনিক চিকিৎসা ও অসুখ অনুসন্ধান পদ্ধতি

সিটি স্ক্যান
মাল্টি স্লাইস

+ এমারজেন্সি
+ ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট
+ ডায়ালিসিস
+ কম্পিউটার চালিত প্যাথলজিকাল অনুসন্ধান পদ্ধতি
+ আধুনিক অসুখ নির্ণয় প্রযুক্তি

- খরচ আয়ত্ত্বের মধ্যে
- হাসপাতালের রোগী বা অনুন্নত শ্রেণীর রোগীদের জন্য পি পি পি রেট চালু
- গত কয়েক বছর সরকারি ও সরকারি আন্ডারটেকিং সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসাক্ষেত্রে জড়িত

Renew life afresh

Eskag SANJEEVANI MULTISPECIALITY HOSPITAL

ESKAG SANJEEVANI PVT. LTD.

For any kind of Information/Assistance
Please Feel Free To Contact Ph: 4025 1800,2554 1818(20 Lines)
Website: www.eskagsanjeevani.com /E-mail: info@eskagsanjeevani.com

আনন্দ উৎসব

হেঁশেল

সেলিব্রিটিদের পুজোর রান্না

বিভিন্ন সেলিব্রিটি পুজোর মধ্যে কী রান্নাবান্না করেন বা করতে ভালবাসেন তার হদিস রইল আপনাদের জন্য

ষষ্ঠীর রান্না হর গৌরি

মানসী সিনহা

কী কী লাগবে

কই বা বড় তেলাপিয়া মাছ, টক দই, লঙ্কা গুঁড়ো, বিট নুন, তেল।

কী করে করবেন

মাছগুলো লাল করে ভেজে রাখুন।

একটা ছড়ানো পাত্রে টক দই, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, বিট নুন দিয়ে ঘন করে মেখে নিন। ফ্রাইং প্যানে সরষের তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, জিরে, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, হলুদ, গরম মশলা দিয়ে কষে নিন। ভাজা মাছগুলোতে কাঁটা দিয়ে দু পিঠে ফুটো করে দিন। মাছের এক পিঠ ফ্রাইং প্যানে কষে রাখা ঝালমশলা ডুবিয়ে কুড়ি মিনিট রেখে দিন। পরে মাছগুলো তুলে অন্য পিঠ টক দইয়ের মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন। এই রান্নার বিশেষত্ব হল মাছের একপাশে ঝালের স্বাদ এবং অন্য পাশে টক-মিষ্টির আস্বাদ পাবেন। তাই এর নাম হর-গৌরি।

সপ্তমীর রান্না প্রন ইন চিলি উইথ অলিভ

রূপাঞ্জনা

কী কী লাগবে

বাগদা চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, রসুন কুচি, অলিভ অয়েল, চিলি ফ্লেক্স, নুন, ধনেপাতা, অরিগানো, বাটার চিজ, গারলিক ব্রেড, ব্ল্যাক অলিভ, লেবু।

কী করে করবেন

বাগদা চিংড়ির মাথা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে রাখুন। ফ্রাইং প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে রসুন কুচি, চিলি ফ্লেক্স, এক টেবিল চামচ অরিগানো দিয়ে হালকা নাড়া-চাড়া করুন। বাগদা চিংড়ি প্যানে দিন। বাগদা চিংড়ি এবং উপকরণগুলো রান্না হয়ে এসেছে মনে হলে সামান্য নুন এবং ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে রাখুন।

গারলিক ব্রেডের উপর সামান্য মাখন বা চিজ এবং রসুন কুচি ছড়িয়ে দিন। এই অবস্থায় ব্রেডটাকে মাইক্রোওভেনে বেক করে নিন। ব্রেড তৈরি হয়ে গেলে, বাগদা চিংড়ির পদটির উপর ব্ল্যাক অলিভ এবং লেবুর রস ছড়িয়ে ব্রেডের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

অষ্টমীর রান্না গোটা মুরগির রোস্ট

বু ল বু লি

কী কী লাগবে

গোটা মুরগি মাথা ছাড়ানো, পেঁয়াজ বাটা ২ বড় চামচ, আদা বাটা ১ ছোট চামচ, রসুন কুচি ১ ছোট চামচ, টক দই, সাদা তেল, নুন, চিনি, তন্দুরি চিকেন মশলা।

কী করে করবেন

মুরগি ভাল করে ধুয়ে নিন। মুরগির পেট থেকে সবকিছু বের করে নিন। এরপর গোটা মুরগির গায়ে কাঁটা দিয়ে ফুটো করে নিন। মুরগির গায়ে টক দই, রসুন, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা এবং তন্দুরি চিকেন মশলা মাখিয়ে নিন। ম্যারিনেট করা মাংস ২ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। কড়ায় সাদা তেল গরম হতে দিন। ম্যারিনেট করা মাংস তেলে দিন। এপিঠ ওপিঠ করে ভেজে মাংস ভালভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে নুন ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

নবমীর রান্না ঝাল ঝাল মাংস

উ র্মি মা লা ব সু

কী কী লাগবে

পাঁঠার মাংস ১ কেজি, সরষে তেল ১০০ গ্রাম, একটা বড় রসুন, আধ ইঞ্চি আদার টুকরো, এক বড় চামচ জিরে গুঁড়ো, তিন বড় চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, দুটো টম্যাটো, বড় আলু দুটো।

কী করে করবেন

আলু এবং মাংস বাদে সমস্ত উপকরণ মিক্সিতে বেটে নিন। সরষের তেল গরম হতে দিন। গরম তেলে বেটে রাখা উপকরণগুলো ছেড়ে দিন। মশলাটা তেলে কিছুক্ষণ নেড়ে মাংস দিয়ে নাড়তে থাকুন। মাংসটা মশলায় পুরোপুরি মাখিয়ে নিন। নুন দিন। এরপর আলু এবং সামান্য জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। পুরো উপকরণ প্রেশারে দিয়ে কম আঁচে ১৫-২০ মিনিট রান্না হতে দিন। ধোঁয়া উঠতে শুরু করলে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

দশমীর রান্না মুগ সামলির মিষ্টি

অ প রা জি তা আ ঢ্য

কী কী লাগবে

মুগ ডাল, চিড়ে, চিনি, খোয়া ক্ষীর, এলাচ গুঁড়ো, কাজু, কিশমিশ, নারকোল বাটা, লবঙ্গ, সাদা তেল, চিনির রস।

কী করে করবেন

চিড়ে কড়ায় দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিন। মুগ ডাল কড়ায় ভেজে আধ সেদ্ধ করে নিন। মুগ ডালের সঙ্গে নুন, চিনি, কালো জিরে দিয়ে চটকে মেখে নিন। মিশ্রণটির থেকে ছোট লেচি কেটে লুচির মতো বেলে নিন। কড়ায় চিড়ের সঙ্গে খোয়া ক্ষীর, কাজু, কিশমিশ, নারকোল বাটা, এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে পুর বানিয়ে নিন। লুচির মধ্যে পুর ভরে মুড়ে নিন। একটা লবঙ্গ আটকে মুখটা বন্ধ করে দিন। সাদা তেলে কড়া করে ভেজে চিনির রসে ফেলুন। রসে ডোবাতে না চাইলে, শুকনোও খাওয়া যেতে পারে এই মিষ্টি।

কথাও কাহিনি ২

দেবযানী সিংহ

প্রচেত গুপ্ত

কৌশিককে বলা আছে যেন অফিস টাইমে ফোন না করে। প্রয়োজনে মেসেজ চলতে পারে। তাও দুটোর বেশি নয়।

কৌশিক অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন! মেসেজ দুটোর বেশি নয় কেন? মেসেজে কী সমস্যা?'

'সমস্যা আছে। তুমি বুঝবে না। একটা অল্পবয়সী মেয়ে অফিসে বসে যদি রাতদিন পুটুর পুটুর করে মেসেজ করে...' এইটুকু বলে চুপ করে গেল শালিনী।

কৌশিক 'কাঁধ ঝাঁকানো' গলায় বলল, 'তো কী?'

শালিনী বিরক্ত হয়ে বলল, 'তো কী বুঝতে পারছ না?'

কৌশিক গলায় ঝাঁজ এনে বলল, 'না, পারছি না। সরকারি চাকরিতে দুটোর বেশি মেসেজ করা বারণ আছে নাকি?'

শালিনী আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'অবুঝের মতো কথা বল না সোনা। দুটো তিনটে বড় কথা নয়। ঘন ঘন মেসেজ এলে লোকে কী ভাববে? সন্দেহ করবে। মেয়ের বিয়ে থা হয়নি, কাজ ফেলে সর্বক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে আছে। এটা কলেজ ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিন নয় কৌশিক। এটা অফিস।'

কৌশিক ফোঁস আওয়াজে নিশ্বাস ফেলে। বলে, 'বিয়ে থা হয়নি বলেই তো মেয়েরা মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। বিয়ে হলে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে পড়তো।'

শালিনী হালকা ধমক দেয়, 'চুপ কর তো। তোমাকে যা বলছি তাই করবে। অফিসে হুটপাট ফোন করবে না।'

কৌশিক মুখ ব্যাজার গলায় বলে, 'ঠিক আছে করব না।'

এরপরেও কৌশিক ইচ্ছেমতো দশটা বারোটা মেসেজ পাঠায়। হুটপাট ফোন করে। আজও করেছে।

শালিনীর বয়েসে রিংটোনে নানারকম গান বাজনা থাকা স্বাভাবিক। আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব চল। নরমাল রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। বাংলা সিনেমার গিটার বাজানো রবীন্দ্রসঙ্গীত। গান বাজলে বাসে ট্রামে সবাই ঘুরে দেখে। যেন এতক্ষণ 'জাগরণে বিভাবরী' শোনার জন্য মন হাঁকুপাকু করছিল। এবার মন জুড়লো। শালিনীর গা জ্বলে যায়। ফোন এলে সবাইকে ঢাক পিটিয়ে জানানোর কী আছে। এই কারণে তার রিংটোনে গান বাজনা কিছু নেই। সাধারণ চেনা ক্রিং ক্রিং। কেউ তাকায় না। তবু অফিসে ঢোকার পরপরই শালিনী রিংটোন বন্ধ করে ফোনকে 'ভাইব্রেট' মোডে নিয়ে যায়। ব্যাগ থেকে বের করে ফাইলের ওপর রাখে। কেউ ফোন করলে যন্ত্র থরথর করে কাঁপে, পিড়িং পিড়িং করে আলো জ্বলে। শালিনী হাতে তুলে নাম দেখে।

কৌশিকের নাম দেখে শালিনী বিরক্ত হল। মোবাইল কানে চেপে ধরতে ধরতে আড়চোখে তাকালো। পুরো আড়চোখে নয়, আধখানা আড়চোখে। আধখানা আড়চোখ কোনও সহজ বিষয় নয়। আড়চোখে ব্যাপারটাই আধখানা। তারও আধখানা মানে চারভাগের একভাগ। ট্যাবলেট ভেঙে খাওয়ার মতো জটিল প্রক্রিয়া। শালিনী এই জটিল প্রক্রিয়া অভ্যেস করেছে। বাধ্য হয়েই করেছে। অফিসে যার তিন হাতের মধ্যে দেবযানী সিংহের মত সহকর্মী বসে তার জটিল প্রক্রিয়া অভ্যেস করা ছাড়া উপায় কী? ফোন এলে কথা শুরুর আগে দেখে নিতে হয় দেবযানী সিংহ কী করছে। ফাইল দেখছে? নাকি ড্যাবড্যাব করে তার কথা শুনছে? দেবযানী সিংহকে দেখেই শালিনী প্রথম জানতে পেরেছে 'ড্যাবড্যাব' করে শুধু দেখা যায় না, শোনাও যায়। গা জ্বলে যায়।

এই মুহূর্তে দেবযানী সিংহ কিন্তু দেখছে না। তার সামনে ফাইল খোলা। মাথা নিচু। ভুরু কোঁচকানো। কালো, মোটা ফ্রেমের চশমা চাপা নাকের ওপর খানিকটা নেমে এসেছে। সম্ভবত ঘামে স্লিপ করেছে। সম্ভবত কেন, তাই হবে। দেবযানী সিংহর নাক সবসময়েই ঘামে। শীত, গ্রীষ্ম বাদ নেই। একটু কাছে গেলেই নাকের পাশে বিজবিজ ঘাম দেখা যায়। বিচ্ছিরি লাগে। মহিলার গায়ের রঙ ময়লা। কালো হলে মেয়েদের অনেক সময় ফর্সার থেকেও সুন্দর লাগে। ময়লা হলে লাগে না। এসবের ওপর এই মহিলার মুখ ফোলা ফোলা, গাল ভারি। নিশ্চয়ই থাইরয়েড ধরনের কিছু আছে। তুলনায় চোখদুটোও ছোটো। যেদিন যেদিন রঙ লাগাতে ভুলে যায় পাশ ফিরলে কানের পাশে পাকা চুল দেখা যায়। হাওয়ায় উড়ছে, আজও দেখা যাচ্ছে। অফিসের রেকর্ডে দেবযানী সিংহর বয়স বিয়াল্লিশ। এই বয়েসে পাকা চুল দেখতে পাওয়ার কথা নয়। বয়সে জল আছি কী না কে জানে। শালিনীর বিশ্বাস, নিশ্চয় আছে।

দেবযানী সিংহ ফাইলে ডুব দিয়ে আছেন। ভাবটা এমন যেন ফাইলে বড় ধরনের গরমিল পাওয়া গেছে। এখন যদি ভূমিকম্পে ঘর বাড়ি কেঁপে ওঠে, কাজকর্ম ফেলে সবাই পড়িমড়ি করে

দৌড়ও দেয়, উনি কিছুতেই চেয়ার ছেড়ে নড়বেন না। ঠাণ্ডা গলায় বলবেন, 'তোমরা যাও। আমি ফাইল শেষ করে আসছি।' শালিনীর সন্দেহ এটা অভিনয়। যতই চোখের সামনে ফাইল খোলা থাকুক, মহিলার কান খোলা এবং সেই কান তার দিকে তাক করা।

মোবাইলে ঠোঁট ঠেকিয়ে শালিনী নিচু গলায় বলল, 'ফোন করলে কেন? তোমাকে না অফিসে দুমদাম ফোন করতে বারণ করেছি।'

ওপাশ থেকে কৌশিক নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'কেন করেছ?'

শালিনী চাপা গলায় বলল, 'হাজার বার তো বলেছি। কথা বলতে অসুবিধে হয়। নতুন চাকরি।'

কৌশিক দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বলল, 'নতুন চাকরি না কচু। আসল কারণ তোমাদের ওই দেবযানী রায়।'

শালিনী বলল, 'রায় না সিংহ।'

কৌশিক চেবানো গলায় বল, 'বাঘ, সিংহ যাই হোক আসলে ইঁদুর। নইলে এভাবে আড়ি পাতে?'

শালিনী চাপা গলায় খিলখিল হেসে ফেলল, 'তোমাকে কে বলেছে ইঁদুর আড়িপাতে?'

'কেউ বলেনি। মনে হল ছুঁচোও হতে পারে। মেয়ে ছুঁচো।'

'ছিঃ ওভাবে বলে না।'

কৌশিক রাগি গলায়, 'তাহলে কী ভাবে বলব? বুড়ি মাগী... ভদ্রতা সভ্যতা নেই... অন্যের টেলিফোনে আড়িপাতে।'

শালিনী গর্বের হেসে বলল, 'সবারটায় না, শুধু আমারটায় পাতে।'

কৌশিক আরও রেগে বলে, 'কেন? তুমি কোন মহারানি যে তোমার ফোনে আড়ি পাততে হবে?

শালিনী খুশি খুশি গলায় বলে, 'মহারানি নয়, মহারাজকুমারি। সুন্দরী এবং অবিবাহিতা। মহারাজকুমারি কোন মহারাজের সঙ্গে কথা বলছে জানবার জন্য উনি ছুঁক ছুঁক করেন।'

'বাজে কথা বলো না শালিনী। ওই মহিলার পাশ থেকে উঠে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলো।'

শালিনী হিসহিসিয়ে গলায় বলল, 'পাগল? এখন শুধু দেবযানীদি শুনছে, আমি উঠে কথা বললে ঘর শুদ্ধু সবাই হাঁ করে থাকবে।'

কৌশিক বলল, 'তাহলে বারান্দায় চলে যাও। তোমাদের অফিসে বারান্দা নেই?'

শালিনী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আছে। সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে গুজগুজ করলে তখন আর ঘর নয়, গোটা অফিসে ফিসফিসানি শুরু হয়ে যাবে। সবাই বলবে, শালিনী মহাপাত্র বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেম করে। অনেকে সিট ছেড়ে দেখতেও আসবে।'

'লম্পটের দল। মেয়ে দেখলেই মাথা ঘুরে যায়।'

শালিনী ফিক করে হেসে বলল, 'লম্পটের দল হবে কেন? সবাইকে তো আর দেখে না। মনে হয় এই অফিসে অনেকদিন পর আমার মতো একজন সুন্দরী এসেছে।'

এই হাসি কৌশিকের গা জ্বলিয়ে দিল। বলল, 'সুন্দরী না ছাই, মেয়ে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

কৌশিকের হিংসেতে শালিনী খুশি হল। আহ্লাদি গলায় বলল, 'আমি অত কিছু জানি না। তুমি ফোন করবে না। কথা বললে সবাই ভাববে আমি প্রেম করছি।'

কৌশিক রাগের মাত্রা বাড়িয়ে বলল, 'টেলিফোনে কথার সঙ্গে প্রেমের কী সম্পর্ক! অন্য কথাও তো হতে পারে। ফোন তো তোমার বাবা-মা করতে পারেন, মেয়েবন্ধুরা করতে পারে, ছোটোমামা, মেজমাসি, রাঙাবৌদিও করতে পারে। পারে না?'

শালিনী এই বিরক্তিতেও মজা পেল। গলা নামিয়ে বলল, 'সবাই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? একটা আনম্যারেড মেয়ের ফোন করার কায়দা দেখলে বোঝা যায় কার সঙ্গে কথা বলছে।'

কৌশিক নাক দিয়ে ফুঃ ধরনের আওয়াজ করে বলল, 'বিরাট ফোন ওস্তাদ এসেছে রে। তুমি আজই সিট চেঞ্জ কর শালিনী। অন্য টেবিলে যাও। দেবাযানী সিংহ থেকে দূর হটো।'

শালিনী একটু চুপ করে রইল। এই কথাটা সে ভাবেনি এমন নয়। তবে বিষয়টা নিয়ে এগোয়নি। তার কারণ দুটো। এক তার চাকরি এখনও নতুন। এই অল্পদিনে সিট চেঞ্জ করতে চাওয়া ডিপার্টমেন্টের কেউ ভাল চোখে দেখবে না। আর দু নম্বর কারণ হল, কোন যুক্তিতে অন্য জায়গায় উঠে যাবে? পাশে বসা কলিগ ফোন করার সময় তার দিকে তাকায় বলে? তাও পুরুষকর্মী হলে কথা ছিল।

শালিনী বলল, 'সরকারি অফিসে ইচ্ছেমতো টেবিল বদলানো যায় না।'

'যত্তসব ফালতু নিয়ম।'

শালিনী নাক দিয়ে 'উঁ উঁ' ধরনের

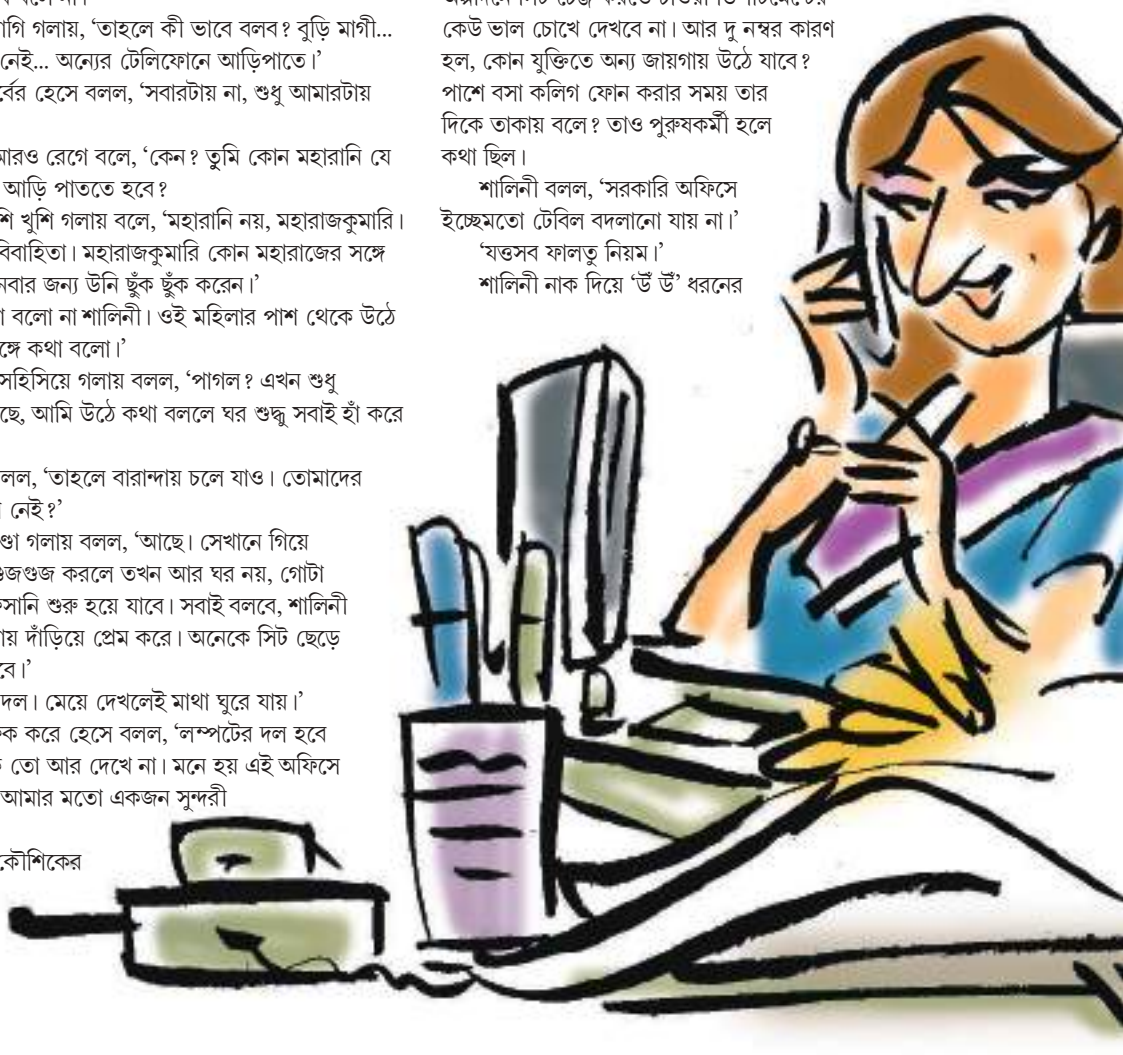

লম্বা আওয়াজ করে বলল, 'তখন তো গভর্মেন্ট সার্ভিস নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করেছিলে। করনি? এখন এসব বলছো কেন?'

কথাটা সত্যি। সরকারি চাকরির ব্যাপারে সবথেকে চাপ দিয়েছিল কৌশিক। শালিনীর বয়স পঁচিশ। মাঝারি ধরনের সুন্দরী। বড় হওয়ার কারণে চোখে একধরনের মায়া ভাব। নাক টিকোলো। গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হলেও ফর্সা। সবথেকে বড় কথা মেয়েটার মাথায় এক ঢাল চুল রয়েছে। আজকাল মেয়েদের মাথায় এত চুল চট করে দেখা যায় না। হয় তারা বেশি চুল কেটে ফেলে, নয়, বেশি চুল লুকিয়ে ফেলে। শালিনী চুল যত্ন করে রেখে দিয়েছে। কখনো লম্বা বেণী করে। কখনো খুলে রেখে রঙীন ব্যাণ্ড লাগিয়ে নেয়। বেশি চুলের কারণে মেয়েটার চেহারায় এক ধরনের অতিরিক্ত লাবণ্য ভাব রয়েছে। সরকারি অফিস ঘরের শুকনো, মলিন, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে শালিনীর সৌন্দর্য যেন আরও বেশি করে চোখে পড়ে। তার বয়সী এবং সুন্দরী কোনও মেয়ে এই ঘরে বসেও না। তবে শুধু দেখতে নয়, শালিনী লেখাপড়াতেও ভাল। কলেজে তার বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি। ন'মাস এবং ন'মাস সাতদিন হল সে চাকরি পেয়েছে। চাকরির দুটো তারিখ হওয়ার কারণ পর পর দুটো চাকরি পাওয়া। বেসরকারি চাকরি আর সরকারি চাকরি। বেসরকারি চাকরিতে পদ ছিল কেমিস্টের। কম্পানি

সাবানের। বজবজ পেরিয়ে ওয়ার্কশপ। সেখানে বসতে হবে। এসি লাগানো আলাদা ঘর। যাওয়া আসার জন্য গাড়ি। সাবানের প্রস্তুত প্রণালীর ওপর নজরদারি করতে হবে। অন্যদিকে সরকারি চাকরিতে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় ছিল না। যেমন পোস্টিং হবে তেমন কাজ। স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, শিল্প থেকে পশুপালন যে কোনও দপ্তরই হতে পারে।

দুটো অ্যাপয়নমেন্ট লেটার হাতে পেয়ে শালিনী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ল। সে চাইল বেসরকারি কম্পানির 'কেমিস্ট' হতে। শুনে সবাই হাউ মাউ করে ওঠে। পরিণত গাধা ছাড়া এই ভুল কেউ করে না। সরকারি চাকরি পাওয়ার মানে এতদিন ছিল হাতে শুধু চাঁদ পাওয়া। এখন চাঁদ সূর্য দুটোই পাওয়া যায়। আয়েসের চাঁদ আর বেতনের সূর্য। খাটাখাটনি আগের মত কমসমই রয়েছে, অথচ বেতন বেড়েছে গাদাখানেক। বেসরকারি জায়গা মানে শুধুই অনিশ্চয়তা। যখন তখন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আগে ঝাঁপ ফেলতে দু-চারদিন লাগত। এখন লাগে একবেলা। সকালে আছে তো বিকেলে নেই। ফোল্ডিং খাট আলমারির মত এখন সব ফোল্ডিং কোম্পানি। প্যাক করে গাড়ির ডিকিতে তুললেই ল্যাটা চুকে গেল। তাও বজবজের বদলে বেঙ্গালুর হলে একটা কথা ছিল। সুতরাং এই ভুল কিছুতেই করা যাবে না। সবথেকে বাগড়া দিল কৌশিক।

'তোমার মাথাটা কি পুরো গেছে শালিনী?'

শালিনী অবাক হয়ে বলল, 'মাথা খারাপের কী আছে? পড়াশুনো করেছি কেমিস্ট্রি নিয়ে, কাজও করব কেমিস্ট্রি নিয়ে।'

'বড় বড় কথা বল না। এমন একটা ভান করছ যেন অক্সফোর্ডে ডক্টরেট করতে যাচ্ছ। তুমি স্কুল কলেজে পড়াবেও না যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন নিয়ে ক্লাস নিতে হবে।'

শালিনী মিনমিন করে বলে, 'মাইনে তো বেশি। তাছাড়া ফেসিলিটি আছে। গাড়ি প্রোভাইড করবে।'

কৌশিক ভুরু তুলে বলে, 'ওইটাই তো ভয়ের। মাইনে কম হলে ভয় ছিল না। প্রাইভেট কম্পানি হল তুবড়ির মতো। চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে তারপর ফুস করে নিভে যায়। সরকারি চাকরিতে সেই চিন্তা নেই। টিমটিম করে হলেও জ্বলতেই থাকে। জ্বলতেই থাকে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে জ্বলছে।'

তুবড়ি জ্বলা এবং নেভার প্রক্রিয়া কৌশিক হাত দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করে দেখাল।

তারপরেও শালিনী বোঝাতে যায়। বলে, 'বন্ধ হয়ে গেলে অন্য কম্পানিতে জয়েন করে যাব। সমস্যা কিছু নেই। বরং ভাল। এক্সপিরিয়েন্স হবে। বেটার কোথাও শিফট করতে সুবিধে হবে।'

কৌশিক উড়িয়ে দেয়, 'রাখো তোমার এক্সপিরিয়েন্স। এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে গাদা গাদা ছেলেমেয়ে হেঁদিয়ে মরছে। আমার মামাতো ভাই সন্তুকে দেখ। ঝোলা ভর্তি সার্টিফিকেট, অথচ চাকরির জন্য মাথা খুঁড়ে কপালে আলু বানিয়ে দিল। তার ওপর আমার কথাটা তো একবার ভাববে।'

শালিনী স্বর ঘন করে বলে, 'সে তো সবসময়ই ভাবি।'

'আহা সে ভাবার কথা বলছি না। বলছি আমার কাজকর্মের কথা। সেটাও তো নড়বড়ে। কতদিন থাকবে তার কোনও ঠিক নেই। প্রাইভেট অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট। মালিক তো রোজই মুখ শুকিয়ে বসে থাকে। ব্যবসা নাকি চলছে না। মাইনে দেবার দিন কান্নাকাটি করে। চোখে জল দেখেছি। কে জানে বেটা সিনেমার অ্যাক্টরদের মতো গ্লিসারিন মারে কি না। নিশ্চয় মারে। চাকরি কবে চলে যাবে ঠিক নেই। অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরি চলে গেলে বিরাট বিপদ। এখন হিসেব দেখার লোক পথেঘাটে পাওয়া যায়।'

শালিনী রসিকতার ঢঙে বলে, 'তোমার চাকরি চলে গেলে সমস্যা কী! তুমি তো আর আমার পয়সায় খাও না।'

'আঃ শালিনী, বোকার মতো কথা বল না। আজকের কথা বলিনি, ফিউচারটা তো ভাবতে হবে। সংসারে দুজনের চাকরি চলে গেলে কেলেঙ্কারি হবে।'

শালিনী হাসে। বলে, 'সংসারই হল না, তার আবার একজন, দুজন।'

কৌশিক সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'আজ হয়নি, কাল হবে।'

শালিনী থমকে গেল। এই 'কাল হবে'তে তার সমস্যা আছে। তবে সমস্যাটা কৌশিককে সে বুঝতে দেয় না। বরং উলটো কথা বলে। কৌশিক ধাঁধা খেয়ে যায়।

'রাখো তোমার সংসার। আমাদের সংসার আর হয়েছে। তোমার হাজার ফ্যাকড়া। বোনের বিয়ে, মায়ের অসুখ, কাকাদের সঙ্গে সম্পত্তির মামলা। কবে সে সব মিটবে আর কবে বিয়ে হবে। আমার সব বোঝা হয়ে গেছে। প্রেম করতে করতেই চুল পেকে যাবে।'

কথায় অভিমান ঝরিয়ে দেয় শালিনী। মেয়েরা এই জিনিস অতিরিক্ত ভাল পারে। মিথ্যে রাগ আর বানানো অভিমান তাদের কাছে জলভাত। পুরুষ মানুষ ধরতে পারে না। বোকা হলে তো একেবারেই নয়। কৌশিক বোকা। সে টেবিলের ওপর হাত বাড়িয়ে শালিনীর আঙুল ধরার চেষ্টা করে। শালিনী হাত সরিয়ে নে।

'আরে বাবা মিটে যাবে বলছি তো। আর বেশিদিন নয়। ছোটকা তো মিটিয়ে ফেলতেই চায়, মেজকা গোল পাকাচ্ছে। মেজকার উকিলটাই যত নষ্টের গোড়া। হারামি একটা।'

শালিনী মুখ ঘুরিয়ে নেয়, চোখ বড় করে বলল, 'তাহলে তোমার মেজকার উকিলের জন্য আমরা বিয়ে করতে পারব না?'

কৌশিক ঝুঁকে পড়ে আবার শালিনীকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ছুঁয়ে যদি মান ভাঙানো যায়। বলে, 'আহা, তুমি রাগ করছ কেন?'

শালিনী বুঝতে পারে তার অভিনয় কাজ করছে। সে আরও সুযোগ নেয়। বলে, 'রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই করছি। আর কদিন অপেক্ষা করতে হয় দেখব।'

কৌশিক বলে, 'এত ছটফট কর না সোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। চিনির জন্য ছেলে দেখা চলছে। যে কোনো মোমেন্টে ফাইনাল হয়ে যেতে পারে।'

শালিনী জোর দিয়ে বলল, 'অবশ্যই ছটফট করব। একশোবার করব, হাজারবার করব। আমার বিয়ের জন্য আমি ছটফট করব না তো কে করবে?

কৌশিক পরিতৃপ্তির হেসে বলল, 'লক্ষ্মী সোনা।'

শালিনী মোটেই বিয়ের জন্য ছটফট করছে না। এখন বিয়ে করাটাই তার কাছে 'সমস্যা'। সে অপেক্ষা করতে চায়। সব কারণেই চায়। বয়স টু ননদ। পঁচিশ বছর বিয়ের জন্য কোনো বয়স নয়। সবে চাকরি পেয়েছে। এখন কটাদিন রোজগার পাতি করে স্বাধীনভাবে টাকা খরচ করে জীবন উপভোগ করতে হবে। শখ আহ্লাদ মেটাতে হবে। এটা সেটা কিনতে হবে। এখানে ওখানে বেড়াতে হবে। কৌশিকের বাড়িতে হাজার ঝামেলা। মা অসুস্থ। সাধারণ হাঁচি কাশির অসুখ নয়, একেবারে শয্যাশায়ী। তার মানে এখন বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পুত্রবধূ কাম আয়ার ভূমিকা পালন করতে হবে। এই মুহূর্তে শালিনী কিছুতেই শাশুড়ির বড় বাইরে, ছোট বাইরে নিয়ে ব্যস্ত হতে রাজি নয়। তার সঙ্গে আছে চিনি। কৌশিকের বোন। সাতাশটা পার্টি দেখেও বিয়ে ফাইনাল হল না। সব পাত্রই চিনির অপছন্দ। ছেলে বেঁটে, ছেলে মোটা, ছেলের বয়স বেশি— হাজার বায়নাক্কা। আসলে ঠেঁটা টাইপ মেয়ে। তার বিশ্বাস তার

বিয়ে হবে কোনও ফুলকুমারের সঙ্গে। নেহাত যোগাযোগ হচ্ছে না তাই। এই ননদকে নিয়ে ঘর করা অসম্ভব। সবসময় ঠোকাঠুকি হবে। তার বিয়ের পরপরই যদি চিনির বিয়ে ফাইনাল হয়ে যায় সেও ফ্যাকড়া। ননদের বিয়ের সব ঝক্কি বউদির ঘাড়ে পড়বে। শুধু ঝক্কি নয়, গাদাগাদা খরচ। জলের মত টাকা বেরিয়ে যাবে। তার বাবা-মাকেও খরচ করতে হবে। নতুন বেয়াইবাড়ি বলে কথা। চিনির বিয়ে হয়ে গেলে তখন আর এই সমস্যা থাকবে না। ঝাড়া হাত পায়ে গিয়ে ওঠা যাবে। এর সঙ্গে সম্পত্তির ঝগড়াঝাঁটিটাও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ঘরবাড়ির কে কোনটা নেবে, কে কোনটা পাবে সব আগে থেকে ঠিকঠাক হওয়াই ভাল। কিন্তু এসব কথা কৌশিককে বলা যায় না। বেচারি দুঃখ পাবে। ছোটো মনের মানুষ ভাববে। বিয়ের আগে ছেলেরা প্র্যাকটিকাল জিনিসটা বুঝতে চায় না। সরল রেখার মতো সব ভাবনা। যাকে বলে স্ট্রেট লাইন থিংকিং। তাদের ধারণা প্রেমিকা বিয়ে করে বাড়ি ঢুকলে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ, এমনকি কাজের লোককেও আছাড়ি পিছাড় দিয়ে ভালবাসতে শুরু করবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবার কথা শুনে সরকারি অফিসে যোগ দিয়েছে শালিনী। খাল বিলের হিসেব রাখা অফিস। বিভিন্ন জেলা থেকে হিসেব আসে। সেই হিসেব সাজিয়ে গুছিয়ে রিপোর্ট লিখতে হয়। সম্প্রতি খাল বিলের সঙ্গে 'ডোবা' এবং 'পানাপুকুর' যুক্ত হয়েছে। কোথায় কত ডোবা, পানাপুকুর আছে, কী অবস্থায় আছে তার রিপোর্ট। শালিনীকে 'পানাপুকুর' পার্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কাজ শুরু হওয়ার মুখেই জটিলতা দেখা দিয়েছে। ঠিক কাকে 'পানাপুকুর' বলা হবে? 'ডোবা' বা 'নয়ানজুলি'র সঙ্গে তার পার্থক্য কী? পানাপুকুর কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ দিয়ে মাপা হবে নাকি গভীরতা দিয়ে? যদি গভীরতা দিয়ে মাপা হয় তাহলে এঁদো ডোবার সঙ্গে তার পার্থক্য কী হবে? 'পানাপুকুর'-এর সংজ্ঞার বিষয়ে কোনো সরকারি জেও এখনো বেরোয়নি। বিষয়টা ওপরওলাকে জানিয়ে একটা চিঠি ড্রাফট করছিল শালিনী। এই সময়ে কৌশিকের ফোন এসেছে।

কৌশিক গলা নামিয়ে বলল, 'একটা খবর আছে।'

শালিনী বলল 'কী খবর!'

'ওই ব্যাপারে।'

শালিনী বলল, 'কোন ব্যাপার?'

কৌশিক গলা আরও নিচু করে বলল, 'বুঝতে পারছ না কোন ব্যাপার?'

শালিনী অবাক হয়ে বলল, 'কই না তো!'

কৌশিক ফিসফিস করে বলল, 'অনিমেষদের ফ্ল্যাটটা শনিবার ফাঁকা থাকবে। হারামজাদা অফিসের কাজে আসানসোল যাচ্ছে। আমাকে চাবিটা দিয়ে যাবে। ওদিন তোমার অফিস ছুটি, বন্ধু টন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে চলে আসবে। আমরা দুজন দরজা বন্ধ করে সারাদিন ওই ফ্ল্যাটে থাকব।'

শালিনীর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, 'ধ্যাৎ।'

ওপাশে কৌশিক ভেংচি কাটার ঢঙে বলল, 'এখন ধ্যাৎ না? তখন তো খালি বলতে টেলিফোনে, মেসেজে আর কত চুমু খাবে? বলতে না? এবার মজা দেখাব।'

শালিনীর শরীর শিরশির করে উঠল। চাপা গলায় বল, 'অ্যাই মার খাবে।'

'ঠিক আছে মেরো। অ্যাই জানো অনিমেষদের বাথরুমটা দারুণ। শাওয়ারের জন্য আলাদা জায়গা। সব দিকে থেকে জল পড়ে। দুজনে একসঙ্গে ওখানে স্নান করব,' বলতে বলতে গলা গাঢ় হয়ে গেল কৌশিকের।

শালিনীর কান গরম। যতই এই সময়ের মেয়ে হোক, শরীরের ব্যাপারে শালিনী খানিকটা প্রাচীনপন্থী। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বন্ধুদের সঙ্গে সেক্স নিয়ে কম গসিপ করেনি, উত্তেজনাও দেখিয়েছে অনেক, কিন্তু নিজেরবেলায় আঁটিসুঁটি থেকেছে। বন্ধুরা 'ঠাকুমা' বলে খেপাত। হিস্ট্রির তনুশ্রী ছিল বেশি ফাজিল। শালিনীর থুতনি নেড়ে বলত, 'এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে আসল যুদ্ধের সময় যে ধেড়াতে হবে মামণি। ইতিহাস পড়নি তো, পড়লে বুঝতে পারতে। অভিজ্ঞতার অভাবে কত বড় বড় দুর্গের পতন হয়েছে। আক্রমণ হলে সামলাতে হবে যে। সব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে হবে। বর অশ্বারোহী এগোলে তোমাকে পাঠাতে হবে পদাতিক। বর যেই কামান দাগবে অমনি তুমি গোলা ছুঁড়ে মারবে... হি হি...।' বলতে বলতে শালিনীর কোলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত বিচ্ছুটা। রীনা বলত, 'আমি কিন্তু বাপু দুর্গের পতনই চাই। কাজে না লাগলে দুর্গ রেখে করব কী?' আবার একচোট হাসি হত।

শালিনী কিছু বলার আগেই দেবযানী সিংহ শালিনীকে চমকে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। দাঁড়ালেন পাশে এসে। ঝুঁকে পড়ল, নিচু গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব শালিনী?' শালিনী বিস্মিত চোখে তাকালো। 'তোমার মায়ের ফোন নম্বরটা একটু দেবে?'

শালিনী বুঝতে পারছে ইদানিং কৌশিকের ছটফটানি হয়েছে। চান্স পেলেই হাত ধরে। কাঁধে হাত দেয়। কনুই ধরে। সেদিন সিনেমাহলে বুকেও হাত দিয়েছে। তবে সামলে সুমলে। অ্যালাও করেছে শালিনী। বেশি আপত্তি করলে অন্য কিছু সন্দেহ করতে পারে। এখনই বিয়ে না করার পরিকল্পনা গোপন রাখতে হবে। তাহলে একেবারে ফাঁকা ফ্ল্যাটে...।

শালিনী বিড়বিড় করে বলল, 'না না।'

কৌশিক আবদারের ঢঙে বলল, 'লক্ষ্মীটি না কোরও না। এরকম সুযোগ আবার কবে আসবে ঠিক নেই।'

শালিনী নিজেকে সামলে বলল, 'সুযোগে কী আছে? বিয়ে করে ফেললেই তো হয়।'

কৌশিক অধৈর্য গলায় বলল, ' সে হবেক্ষণ। আমার আর তর সইছে না। তুমি কিন্তু সেদিন অফিস ড্রপ করবে। সারাদিন থাকব।'

শালিনী ফিস ফিস করে বলল 'বাড়াবাড়ি কোর না।'

'একশোবার করব। অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে তো করছি না, বাড়াবাড়ি করছি হবু বউকে নিয়ে।'

শালিনী চুপ করে রইল। একটু থমকেই গেল যেন। কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি তো সে কৌশিকেরই স্ত্রী হবে। সম্পর্কের কথা অনেকেই জানে। বাড়িতেও বলা আছে। সবটা নয়, ঠারেঠোরে বলে রেখেছে।

'মা, আমার বিয়ে নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। সময় হলে আমিই বলব।'

'তোর পছন্দের কেউ আছে?'

'বলছি তো মাথা ঘামিও না। আমি ঠিক বলব।'

'আহা, আমাকে বল না। ছেলেটা কে?'

শালিনী মায়ের গাল ধরে হাসতে হাসতে বলেছে, 'বোম্বাগড়ের রাজা।'

'সে আবার কী!'

শালিনী মায়ের দু কাঁধে হাত রেখে, চোখ বড় বড় করে বলেছে, 'সে আছে। ঠিক সময় অ্যাপিয়ার করবে। তুমি বাপিকে বুঝিয়ে বলো। আর আমাকে ঝাড়া হাত পায়ে কটা দিন চাকরি করতে দাও।'

এই ইঙ্গিতেই মা মোটামুটি বুঝে গেছে। আর বিরক্ত করেনি।

কৌশিক বলল, 'কী হল চুপ করে আছো কেন?'

শালিনী মুহূর্তখানেক ভেবে বলল, 'ঠিক আছে পরে বলব। এখন ছাড়ছি।'

কৌশিক বলল, 'পরে নয়, এখনই। নইলে ফোন ছাড়ব না। তোমার অফিসে গিয়ে হাজির হব।'

কৌশিকের ছটফটানিতে শালিনীর হাসি পেল, ভালও লাগল। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে থাকার খুব শখ হয়েছে বাবুর।

'তুমি তো আমায় জান কৌশিক... আমি এসব একদম পারি না... জান না?'

কৌশিক ঘন গলায় বলল, 'তোমাকে কিছু পারতে হবে না। যা পারবার আমিই পারব। বেশি কিছু নয়, শুধু একটু আদর...। সেদিন না হয় ধরেই নেব আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।'

বিয়ে হয়ে গেছে! শিরশিরানির সঙ্গে শালিনীর শরীর এবার হালকা কেঁপে উঠল। সেই কাঁপুনিতে লজ্জা, উত্তেজনা দুটোই আছে। ফিসফিস আর আহ্লাদ মেশানো গলায় বলল, 'বেশি কিছু নয় কিন্তু। তোমার আজকাল খুব খারাপ স্বভাব হচ্ছে।'

কৌশিক খুশি হল। আঁশটে হেসে বলল, 'বর বউকে আদর করবে তার আবার কম বেশি কী?'

নেকা নেকা, হাস্যকর এবং বোকামির চূড়ান্ত তবু কৌশিকের মুখে 'বউ' কথাটা বার বার শুনতে ভাল লাগছে। কথাটার মধ্যে ছলাকলা কিছু নেই। না, ছেলেটা সত্যি বোকা।

শালিনী বানানো রাগ দেখিয়ে মোবাইলে মুখটা ঠেকিয়ে বলল, 'চুপ কর। আমি কিন্তু বলে রাখছি, বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। তেমন হলে আমি সোজা চলে আসব।'

কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে মহারানি, সরি মহারাজকুমারি, আগে তো রাজকুমারের কাছে এসো।' শালিনী হেসে বলল, 'রাজকুমার না ইয়েকুমার। অ্যাই আমি এখন রাখছি। উরিবাবা কতক্ষণ বকলাম...।

মোবাইল রেখে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল শালিনী। ছেলে খুব বেড়েছে। ঠিক আছে, দেখা যাবে কত বেড়েছে। কথাটা ভেবে শালিনী ফের একটা হালকা উত্তেজনা বোধ করল। নিজের মনেই হাসল। সামান্য এইটুকুতেই উত্তেজনা। হবু স্বামীর সঙ্গে স্নান করবে ভেবে। সত্যি যখন স্নান করবে তখন কী হবে? তনুশ্রী ফাজিলটা থাকলে নিশ্চয় হেসে গড়িয়ে পড়ত। বলত, 'ঠক ঠক করে কাঁপবি আর কৌশিককে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরবি।' যাই হোক, এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। শুধু আদরের কারণে নয়, অন্য ব্যাপারও আছে। সেদিন কৌশিক প্রস্তাব দিয়েছে, এখনই বিয়েটা সেরে ফেলা যাক। না হয় বাইরে কোথাও ভাড়া বাড়ি নেওয়া যাবে। রোজ যাতায়াত করলেই তো হল। গভীর ভাবে কিছু বলেনি কৌশিক, হালকা ভাবেই কথাটা তুলছে। এটাও বিপদের। ধারণা মাথায় গেঁথে গেলে মুশকিল। এইসব সিচ্যুয়েশনে আলাদা হয়েও লাভ হয় না। বরং ঝক্কি বাড়ে। এবাড়ি ওবাড়ি ছোটাছুটি করে হেদিয়ে মরতে হবে। শাশুড়ি 'ওরে বাবলু, মারা যাচ্ছি' বলে রোজ মাঝরাতে ডেকে পাঠাবে। তার থেকে সবকিছু থিতু হোক। তার আগে না হয় মাঝে মাঝে এরকম অনিমেষদের ফ্ল্যাট ট্যাট পেলে ছেলেটা খানিকটা শান্ত হবে। এসব ভাবতে ভাবতে ঘাড় ঘোরালো শালিনী। দেবযানী সিংহ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। ইস্‌স! মহিলার কথা একেবারে মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিছু শুনতে পেল নাকি? নিশ্চয়ই পেয়েছে। এত কথার মধ্যে দুটো একটা কী শুনবে না? ছি ছি। কিছু বুঝতে পারেনি তো? মহিলার ঠোঁটের কোনায় হালকা একটা হাসির মত কেন? নিশ্চয় চোখ মুখ দেখে কিছু বুঝতে পেরেছে। নার্ভাস হেসে শালিনী স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল।

যা কোনদিন করেনি, দেবযানী সিংহ আজ তাই করলেন। চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, 'সমস্যা?'

শালিনী ঢোঁক গিলে বলল, 'কী বিষয় বলুন তো দেবযানীদি?'

দেবযানী সিংহ বললেন, 'না, কোনো বিষয় নয়। ফোনে যখন তুমি কথা বলছিলে দেখলাম...।'

চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল শালিনীর। কী সাহস। নিজেই বলছে কথা বলার সময় দেখছিলাম। অদ্ভুৎ নির্লজ্জ মহিলা তো! আজই কড়া ভাবে বলে দিতে হবে। শালিনী মুখ গম্ভীর করে বলল, 'কী দেখছিলেন?'

দেবযানী সিংহ খানিক সামলে নিয়ে বললেন, 'মুখের ভাব দেখে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগল।'

শালিনী মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'না কিছু হয়নি।'

কথাটা বলে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে জল খেল শালিনী। মুখ মুছতে মুছতে ঠিক করল এই নির্লজ্জ মহিলাকে আজই বলতে হবে। অনেক হয়েছে। আর ভদ্রতা নয়। দেরিও নয়। এ আবার কী কথা! এতো বাড়াবাড়ির চরম! ফোনের সময় মুখের ভাবভঙ্গি দেখছে! শালিনী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবে। দেবযানী সিংহর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তারপর নিচু গলায় বলবে।

'শুনুন দেবযানীদি, আপনি সিনিয়র মানুষ, কথাটা বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু না বলে পারছি না... আগেও লক্ষ্য করেছি... আমি যখন ফোনে কথা বলি আপনি শোনবার চেষ্টা করেন... দয়া করে এটা করবেন না... আমার অসুবিধে হয়...।

নাকি আরও কড়াভাবে বলবে?

'শুনুন দেবযানীদি, অন্যের কথা লুকিয়ে শোনাটা একটা অন্যায়। আপনি কোনও ছেলেমানুষ নন। তবু দিনের পর দিন সেই অন্যায় কাজটা করেন। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। যদি করেন আমাকে স্টেপ নিতে হবে।'

শালিনী কিছু বলার আগেই দেবযানী সিংহ শালিনীকে চমকে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। দাঁড়ালেন পাশে এসে। ঝুঁকে পড়ল, নিচু গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব শালিনী?'

শালিনী বিস্মিত চোখে তাকালো।

'তোমার মায়ের ফোন নম্বরটা একটু দেবে?'

'মায়ের ফোন নম্বর কেন?'

দেবযানী সিংহ হালকা হেসে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সেটা তোমার মাকেই বলব। যদি বল, তোমার বাড়িই চলে যাই। সেটাই ভাল। এই শনিবারই যাব। দেরি করব না।'

হতভম্ব শালিনী আমতা আমতা করে বলল, 'আপনি আমার বাড়ি! মানে...।'

এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবযানী সিংহ হাসি মুখেই বলল, 'ঠিকানাটা বল।'

অবাক শালিনী আরও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ময়লা রঙের নাক চাপা, চোখ ছেটো মহিলার কথার মধ্যে এক ধরনের জোর এবং আত্মবিশ্বাস আছে। কী হয়েছে!

শনিবার সকালে দেবযানী সিংহ শালিনীর বাড়ির দরজায় বেল টিপলেন।

শালিনী এখন থাকে ছোটো একটা শহরে। খুব সুন্দর। মাঝে মধ্যে মনে হয়, সত্যি নয়, আঁকা। লণ্ডন শহর থেকে মাত্র ঘণ্টাখানেকের ড্রাইভ। বাংলোটা চমৎকার। দেবায়ুধের মতোই ঝকঝকে আর স্মার্ট। তার মতই যেন সবসময় হাসিখুশি। বিয়ের এক বছর হুড়মুড় করে কেটে গেল। বিয়েটা হয়েছিলও হুড়মুড়িয়ে সাতদিনের নোটিসে। শনিবার কথা, রবিবার দেখা, বুধবার রেজিস্ট্রি। ছেলের ছুটি ছিল না। এখানে শালিনী আবার চাকরিতে জয়েন করেছে। কেমিস্টের কাজ। যদিও দেবায়ুধের ইচ্ছে ছিল, তার স্ত্রী আরও লেখা পড়া করুক। শালিনী রাজি হয়নি। তার আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। দেবায়ুধ হালকা চাপ দিয়েছিল। সেই চাপ টেঁকেনি। তার আর লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না। শালিনী কলকাতায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কখনো মেলে, কখনো স্কাইপে, কখনো সরাসরি ফোনে। নিজের বাবা-মাকে করে, দেবায়ুধের আত্মীয়দেরও করে। কৌশিককেও করেছে। তার মায়ের খবর নিয়েছে। আনন্দের কথা, উনি খানিকটা ভাল আছেন। চিনিও মেল করেছিল—'লিনীদি, দেবায়ুধদার মতো আমার একটা বর খুঁজে দাও। বিদেশে থাকে। বাংলো না থাকুক, ফ্ল্যাট থাকলেই চলবে।' শালিনী খোঁজাখুঁজি শুরুও করছে। চিনি দারুণ উত্তেজিত। সবমিলিয়ে শালিনীর ওপর সবাই খুশি। শালিনী নিজেও।

আজ খানিক আগে সে ফোন করেছিল দেবায়ুধের মাসিকে।

'মাসি, অফিসে আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।'

'কী কাণ্ড?'

'মজার কাণ্ড আমি মোবাইলে তোমার ভাইপোর সঙ্গে কথা বলছিলাম, হঠাৎ আধখানা আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, পাশের টেবিলের বুড়ি মেম নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে ড্যাবড্যাব করে আমার কথা শুনছে। মনে হয় বোনপোর জন্য পাত্রী খুঁজছে। হি হি।'

ফোনের ওপাশে দেবযানী সিংহও খুব হাসলেন। হাসতেই লাগলেন।

আনন্দ উৎসব শারদীয়া

বিশেষ রচনা

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার নির্ঘন্ট

পুজোর পাঁচদিনের খুঁটিনাটি জানাচ্ছেন প্রীতিকণা পালরায়

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অবধি দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়াদশমী নামে পরিচিত। সমগ্র পক্ষটি পরিচিত দেবীপক্ষ নামে। দেবীপক্ষের সূচনা হয় পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন। এই দিন মহালয়া অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি হয় পঞ্চদশ দিন অর্থাৎ পরবর্তী পূর্ণিমায়। এই দিনটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। এদিন হিন্দুদের ঘরে ঘরে ধন ও শ্রী-র দেবী, লক্ষ্মীদেবীর পুজো হয়।

প্রধান পূজার প্রায় এক পক্ষ আগের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে অনেক বাড়িতে কল্পারম্ভ হয়। প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত পূজা ও চণ্ডীপাঠ চলে। কোথাও প্রতিপদ, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতেও কল্পারম্ভ হয়। বর্তমান বারোয়ারি পুজোর বাড়বাড়ন্তের সময় এত দীর্ঘকালব্যাপী পুজো সাধারণত হয় না। তবে আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী থেকে সব স্থানেই মূল পুজো শুরু হয়ে যায়। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বেলগাছের তলায় দেবীর বোধন বা জাগরণ। দেবতাদের শয়নকালে (আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস) অসময়ে দেবীর এই বোধন অকাল বোধন নামে পরিচিত।

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যের স্পর্শে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। এসব দ্রব্যের মধ্যে থাকে দধি, ঘৃত, ফল, মৃত্তিকা, শিলা, ধান, দূর্বা, ফুল, আতপচাল, সিঁদুর, কাজল, শ্বেতসর্ষে, গোরচনা, সোনা, রুপো, তামা, দীপ, দর্পণ, চামড়।

সপ্তমীর পুজো শুরু হয় কলাবউ বা নবপত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গণেশের প্রতিমার পাশে কলাবউ স্থাপিত হয়। তাই অনেকের ধারণা কলাবউ গণেশের স্ত্রী। আসলে কলাবউ অবগুণ্ঠনবতী নববধূর বেশে সজ্জিত অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতো দিয়ে বাঁধা শক্তির নানা রূপের অধিষ্ঠান, কলা প্রভৃতি নয়টি বিভিন্ন গাছের চারা। সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। কাছাকাছি জলাশয় থেকে জল এনে কাঁসর, ঘণ্টা, ঢাক নানা বাদ্য সহযোগে মন্ত্র পড়ে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। মহাস্নানের পর সপ্তমীর মূল পুজো শুরু হয়।

মহাষ্টমীর পুজোর মূল আকর্ষণ সন্ধিপূজা। বলা হয় মহাষ্টমীর শেষ এক দণ্ড ও মহানবমীর প্রথম এক দণ্ড, এই দুই দণ্ড অর্থাৎ ২৪+২৪ মোট ৪৮ মিনিটে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে ত্রিশূলবিদ্ধ করেন। শুভ-অশুভের লড়াইয়ে তাই অশুভ শক্তির বিনাসের সেই কাল স্মরণ করে সন্ধিক্ষণে পশুরূপী অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয়। এক সময় পশুবলির চলই বেশি ছিল, বর্তমানে চালকুমড়ো বলি দিয়ে নিয়ম রক্ষা করা হয়। অষ্টমী-নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজায় দেবী চামুণ্ডার পূজা হয়।

নবমীতে হয় শত্রু বলির অনুষ্ঠান। পিটুলি দিয়ে তৈরি শত্রুর প্রতিকৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করে খড়্গ দিয়ে কাটাই শত্রুবলির অনুষ্ঠান। নবমীর দিন শত্রুবধের আনন্দে ঘরে ঘরে মাংসভাত খাওয়া বাঙালি দুর্গোৎসবের একটি প্রচলিত প্রথা হয়ে গেছে।

দশমীর সকাল থেকেই বাতাসে ভাসে বিষাদ ধ্বনি। এদিনের সংক্ষিপ্ত পূজার শেষেই দেবী বিদায়ের সুর বেজে ওঠে। দধিকর্মা দই-খই মুড়কি-কলা একসঙ্গে মেখে দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। কেউ কেউ গৃহস্থের কন্যাসম উমাকে পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে পাঠানোর আগে ভিজে ভাত ও কচুর শাকের মত সাধারণ খাবার নিবেদন করে থাকেন। এরপর দেবীর বিদায়ের ব্যথা সরিয়ে সধবা নারীরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠে।

আনন্দ উৎসব

পোশাকি বাহার

এবার পুজোর শাড়ির ফ্যাশন

পুজো মানে নতুন পোশাক, নতুন সাজ, নতুন গন্ধ। পুজো মানে শাড়ি, গয়না, জুতো, প্রসাধন। পুজো মানে সাজ সাজ রব। এবার পুজোয় কী শাড়ি না পরলে নয়, তারই নমুনা রইল। পরেছেন বাংলা ফিল্ম ও টেলিভিশন জগতের তিনকন্যা। বেছে নিন আপনার পছন্দের শাড়ি ও সাজ

সপ্তমীর সাজ

গার্গীস বুটিকের সুতির রঙিন বৈচিত্র। ঢাকাই কাজ আঁচলে দিয়েছে অন্য মাত্রা। রুপোর গয়না এ শাড়ির সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই।

মডেল ·. পৌলমী দাস

শাড়ি ·. গার্গীস বুটিক ৯৮৩০২২৪৮৩২।

অষ্টমীর সাজ

তসরের উপর লাল টেম্পল নকশা ও গায়ে রঙিন বুটির কাজ। সোনালি সুতোর ছোঁওয়ায় এ শাড়ি অনন্য। সঙ্গে স্টোন এর গয়না।

মডেল ·. তিলোত্তমা দত্ত

শাড়ি ·. সংস্কৃতি, ১২ জামির লেন, বালিগঞ্জ, ৬৫২২২৪৩৪, ২৪৪০-১৬৭০,

e-mail : laliadg@yahoo.com

নবমীর সাজ

সবুজ পাড় বসানো নকশি এই সিল্ক শাড়ির সঙ্গে ডিজাইনার ব্লাউজ সাজটিকে করেছে পূর্ণাঙ্গ।
মডেল ·. তিলোত্তমা দত্ত
শাড়ি ও গয়না ·. দেবশ্রী'স, জি ২৩৯/২, হিন্দুস্তান পার্ক, ২৪৬৬-৯২৭০/৭১

দশমীর সাজ

লাল-সাদা-তসর-সবুজ ও সোনালি রঙে মিলে মিশে দশমীর এই সাজ অনন্য। এক্ষেত্রে সঠিক গয়না দিয়েছেন দেবশ্রী। সিঁদুর খেলার জন্য তৈরি সাজ। বিজয়া সম্মেলনীতেও চোখ কাড়বে।
মডেল ·. অদিতি চ্যাটার্জি
শাড়ি ও গয়না ·. দেবশ্রী'স, মঞ্জুশ্রী সিনেমা কমপ্লেক্স, হলদিয়া, ০৩২২৪-২৭২১৯৮
ছবি ·. আশিস সাহা

পুজো বলে কথা! এই কটা দিন শিশুকে যে সুস্থ রাখতেই হবে। আর মা হিসেবে এই গুরু দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। শিশু সুস্থ থাকলেই সে এই দিনগুলো উপভোগ করতে পারবে। পারবেন আপনিও। প্রয়োজনে দু-একটা প্যান্ডেল দর্শন করা এবারের মতো বন্ধ রাখুন। বিশেষ করে, যেখানে লাখ লাখ দর্শনার্থী ভীড় জমায় সে জায়গাটা এড়িয়ে চলুন। এছাড়াও শিশুকে সুস্থ রাখতে খেয়াল রাখতে হবে বেশ কয়েকটি বিষয়। কীভাবে পুজোর দিনগুলোতে শিশুকে সুস্থ রাখবেন এ বিষয়ে জানাচ্ছেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরুণালোক ভট্টাচার্য

পুজোয় শিশুকে সুস্থ রাখুন

সর্দিকাশি

পুজো এবার দেরি করে পড়েছে। সময়টা পুরোপুরি ঋতু পরিবর্তনের। তাই এ সময় সর্দি-কাশির প্রবণতা বেড়ে যায় প্রচুর পরিমাণে। যাদের সর্দি কাশির ধাত আছে তাদের তো আশঙ্কা বাড়েই, যাদের তেমন একটা নেই তাদেরও হতে পারে। তাই খুব ছোট, যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি, তাদের খুব ভিড়ের মধ্যে না নিয়ে যাওয়াই ভাল। আর অত ছোট শিশু কিন্তু পুজোর আনন্দ কিছু উপভোগ করতেও পারে না। তুলনায় একটু বড়দেরও খুব ভীড়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ ভিড়ের মধ্যে একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ভাইরাসের ইনফেকশন খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। আর যে শিশুর ইতিমধ্যে সর্দিকাশি হয়েছে তাকে তো নেওয়া উচিতই নয়। সেক্ষেত্রে সর্দিকাশি জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

সময়মতো প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে শিশুর চট করে সর্দিকাশি হয় না। হলেও খুব জটিল আকার ধারণ করতে পারে না। এজন্য ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইত্যাদি নিয়মিত যে টিকা দেওয়া হয় সেগুলো এবং সর্দিকাশির জন্য নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন নিলেও সর্দিকাশির প্রকোপ কম থাকে।

একান্তই যদি ঠাণ্ডা লাগে, অল্প অল্প জ্বর থাকে তাহলে প্যারাসিটামল কিংবা হালকা সর্দিকাশির ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে। ২-৩ দিনে যদি সমস্যা না কমে, কাশি ক্রমশ বাড়তে থাকে, কাশির সঙ্গে জ্বর আসে, যদি দেখা যায় শিশু ঝিমিয়ে পড়ছে তাহলে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানো দরকার। ডাক্তারবাবু রোগীর শারীরিক সমস্যা দেখে প্রয়োজনে

অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন। কিন্তু নিজে থেকে শিশুকে অ্যান্টিবায়োটিক কখনও দেবেন না।

জ্বর

এ সময় জ্বরের জন্য মূলত ভাইরাল ইনফেকশনই দায়ী। তবে ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর প্রকোপ কম থাকলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই শিশুর জ্বর হলে ২-৩ দিন প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিয়ে লক্ষ করা দরকার তাতে উপসম হচ্ছে কি না। যদি জ্বর না কমে তাহলে রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া দরকার কী কারণে জ্বর হচ্ছে। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা দরকার। ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু থেকে দূরে থাকতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে হবে। মশা তাড়ানো ওষুধ ব্যবহার করলেও বাড়ি ঘর দোর সাফ সুতরো রাখবেন। জল জমতে দেবেন না। যদি খুব মশার উপদ্রব থাকে তাহলে শিশুকে মশারি বা মশাহীন ঘরে রাখবেন।

কানে ব্যথা

ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরে দিব্যি সুস্থ শিশু ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে শুরু হল কানে ব্যথা। এটা শিশুদের খুব সাধারণ একটা সমস্যা। ঋতু পরিবর্তনের সময় কানে ঠাণ্ডা লেগে এমন বিপত্তি অনেক সময়ই দেখা দেয়। এটা মধ্যকর্ণের প্রদাহজনিত সমস্যা। একে বলা হয় অটাইটিস মিডিয়া। এরকম ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

পেটের গণ্ডগোল

পুজোর কদিন বড়দেরই খাওয়া দাওয়ায় লাগাম থাকে না তো শিশুদের দোষ দিয়ে লাভ কী! একটু বড়রা নিজেরাই বাইরের ফাস্টফুড বা স্ট্রিটফুড কিনে খান। তার থেকে পেটের গন্ডগোল দেখা দেয় হামেশাই। তাই ঠাকুর দেখতে বা পুজোয় বেড়াতে বেরিয়ে বাইরের জল বা খাবার খাওয়া একদম ঠিক নয়। শিশুর জন্য জল ফুটিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। বাইরে ঘুরলে তেষ্টা পাবেই। সে সময় বাইরের জল খেলে তার থেকেই বেশিরভাগ সময়ে শরীর খারাপ হয়। বাইরের কাটা ফল, রঙিন জল কোনও অবস্থাতেই খাওয়া চলবে না। সঙ্গে করে ঘরে তৈরি খাবারও শিশুর জন্য নিতে হবে। যত বড় হোটেল বা রেস্তোরাঁই হোক না কেন, এসময়ে খাবারের গুণমান ঠিকরাখা সম্ভব হয় না। এসব জায়গাতেও এত ভীড় হয় যে প্রচুর পরিমাণে খাবার তৈরি করতে হয় অল্প সময়ের মধ্যে। ফলে স্বাস্থ্যকর উপায়ে খাবার তৈরি করা সম্ভব হয় না। তাই অন্তত পুজোর কটা দিন শিশুকে বাইরের খাবার না খাওয়ানোই ভাল।

কোনও শিশুর যে কোনও কারণে যদি পেট খারাপ হয়, বার বার জলের মতো পায়খানা, সঙ্গে বমি বা বমিভাবের সমস্যা থাকে, তাহলে প্রথম এবং প্রাথমিক চিকিৎসা হল ওআরএস বেশি করে খাওয়ানো। কিন্তু যদি এতেও কাজ না হয় শিশু ঝিমিয়ে পড়তে থাকে, তেষ্টা পায়, কান্নার সময়েও চোখ থেকে জল না বেরয় তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জুতো-জামায় বিপত্তি

পুজোয় নতুন জামা-কাপড় পরলে যে সব শিশুর সেনসিটিভ স্কিন তাদের সমস্যা হতে পারে। গায়ে লাল চাকা মতো কিংবা চুলকানোর সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যা আবার সিনথেটিক কাপড় থেকেই বেশি হয়। তাই শিশুদের সুতির জামা পরানো ভাল। নতুন জামা জলে ভাল করে ধুয়ে পরালে অ্যালার্জির সমস্যা অনেক কম হয়।

খুব বেশি অ্যালার্জি হলে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ দিতে হতে পারে। ৬ মাসের নিচে বয়স এমন শিশুদের যদিও এই ধরণের ওষুধ দেওয়া যায় না। কিন্তু তারপর থেকে দেওয়া যেতেই পারে। তবে জানতে হবে অ্যালার্জির কারণ কী? অর্থাৎ কী থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২-৩ সপ্তাহ অবধি অ্যালার্জি স্থায়ী হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। সম্ভাব্য কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন নতুন জামাকাপড়, কসমেটিক্স, কোনও বিশেষ লোশন কিংবা অ্যাটমসফিয়ার। বাড়ির গাছে কোনও নতুন ফুলের কুঁড়ি এলে তার থেকে যেমন অ্যালার্জি হতে পারে, তেমনই কোনও ওষুধ ঘরে স্প্রে করলে তার থেকেও সমস্যা হতে পারে। এমনকী কোনও মাদুলি বা মেটালের গয়নাও অ্যালার্জির জন্য দায়ী হতে পারে।

নতুন জুতো থেকে ফোসকা পড়ার সমস্যাও পুজোয় খুব কমন। শিশুদের জুতো যত আগেই কিনে দেওয়া হোক না কেন, তারা পুজোর আগে পরতে চায় না। ফলে নতুন জুতো পরে একটু বেশি হাঁটা চলা করলেই ফোসকা পড়ে যায়। ফোসকা থেকে দূরে রাখতে শিশুকে আগে থেকেই জুতো পরিয়ে হাঁটা চলা করাতে হবে। আর অবশ্যই সঠিক মাপের জুতো কিনতে হবে। হিল তোলা জুতো ছোটদের জন্য না কেনাই ভাল। তাতে বিপত্তির আশঙ্কা থাকে অনেক বেশি। পায়ে যদি ফোসকা পড়েই যায় তাহলে অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগাতে হবে। ফোসকা গলে গেলে খেয়াল রাখবেন সেখানে যেন ধুলো-ময়লা না লাগে। আর কখনই সিনথেটিক মোজা পরাবেন না।

মনে রাখুন

- শিশুকে বার বার হাত ধোওয়া অভ্যাস করান। বিশেষ করে বাইরে থেকে ফিরে এবং খাওয়ার আগে যেন ভাল করে হাত ধুয়ে নেয়। এতে করে সহজে ভাইরাল ইনফেকশন ছড়াতে পারবে না।
- শিশুর পেটের সমস্যা হলে প্রথম থেকেই ওআরএস দিন।
- নতুন জুতো যেন খুব বেশি আটোসাটো না হয়। তাতে ফোসকা পড়ার আশঙ্কা থাকে।
- বাইরের জল একদম খাওয়াবেন না। যেখানেই যান না কেন এমনকী রেস্তোরাঁতে খেতে গেলেও সঙ্গে নিন ফোটানো জল।
- বাইরের খাবারও শিশুকে না দিলেই ভাল। দিলেও দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা কতটা স্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি।
- শিশুকে যত কম প্রসাধনী লাগাবেন ততই ওর পক্ষে মঙ্গল। কারণ শিশুর নরম ত্বকে যে কোনটা অ্যালার্জির সৃষ্টি করবে তা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয়।
- নতুন জামাও জলে ধুয়ে শিশুকে পরানো ভাল।
- রাত জেগে ঠাকুর দেখার প্রোগ্রামে থাকলে তাতে শিশুকে সামিল করবেন না। শিশুর সঠিক পরিমাণ বিশ্রামে যেন ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

কথা ও কাহিনি ৩

চাঁদের মানুষ ভাসান ৬

সমরেশ মজুমদার

মানুষগুলো উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে মন্দিরের সামনে। চোরদুটো মাটিতে বসে আছে। এর ওর হাতে পায়ে ধরছে তারা। দূর থেকে ভাসান, জগত এবং বর্ষাকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। তখন সূর্য উঁকি মেরেছে আকাশে। পৃথিবী পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। ভাসান জনতার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কী বলল?'

সনাতন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

ভাসান হেসে জগতকে দেখাল, 'ওর কাছেই তো শুনলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর আপনারা ওদের মন্দিরের ভেতরে দেখেছেন। তা ঘুম কেমন হল? ভাল হয়েছে তো?'

একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ সনাতন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ওই চোরদুটোকে বন্দী করলে কী করে বাবা? এই যাঃ, আপনি না বলে তুমি বলে ফেললাম।'

'তুমিই তো বলবেন, আমি আপনার ছেলের বয়সী। হ্যাঁ, ওদের বন্দী করার পেছনে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। ওরা অসৎ উদ্দেশ্যে মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছিল। আমি বাইরে থেকে শেকল টেনে দিয়েছিলাম।' আপনারা দেখছি ইতিমধ্যে ভাল রকম প্রহার করেছেন দুটোকে। এবার ছেড়ে দিন।' ভাসান বলল।

'এরা মন্দিরের দেবীমূর্তির সোনার গহনা চুরি করতে ঢুকেছিল, পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে ছেড়ে দিতে বলছ বাবা?' সনাতন গলা তুলে বললেন।

'বেশ আপনাদের যেটা ভাল মনে হবে তা করুন।' ভাসান এবার বুড়ির ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল।

জনতা এবার ধন্দে পড়ল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে এসেছে মানুষটা সে বলে গেল ছেড়ে দিতে। এই মানুষ আসার পরে দীর্ঘদিন পরে গত রাতে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে। এই মানুষটার স্পর্শেই জগা পাগলার এত দিনের পাগলামি দূর হয়ে গিয়ে শান্ত ভদ্র মানুষ হয়েছে। বউ বাপের বাড়ি গিয়ে আর ফিরছে না বলে যে মানুষটার বুক জ্বলে যেত, কাতর হয়ে পড়েছিল, তার বুকে হাত রাখল যেই ওমনি সে শান্ত হয়ে গেল।

অথচ মানুষটা কোথায় থাকে তা ওর মনে নেই। কে যে সেখানে আছে তাও ভুলে গেছে। ভোর রাতে যখন চাঁদ বিষণ্ণ তখন মানুষটাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল বলে কেউ বলেছিল, চাঁদের দেশের মানুষ। চব্বিশ ঘণ্টায় এখানকার সবাই ওকে তাই ভেবে নিয়েছে। এই চাঁদের দেশের মানুষ ভাসান বলে গেল চোরদের ছেড়ে দিতে। আবার অন্যেরা বলছে জেলখানায় ঘানি না ঘোরালে শোধরাবে না ব্যাটারা। আজ ছেড়ে দিলে, কাল আবার আসবে চুরি করতে। সেটাও যেমন ঠিক কথা, আর একজন মনে করিয়ে দিল, জেল যদি ওদের শোধরাতে পারত তাহলে ইতিমধ্যে শুধরে যেত। বছরে বার দুয়েক ওরা শ্রীঘরে থাকে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়দলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কয়েকজন ওদের ধরে নিয়ে থানায় চলে গেল। সনাতন ব্যাপারটা পছন্দ করল না। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর মধ্যে অন্য চিন্তা প্রবল হচ্ছিল। ভাসানকে যখন বিলের ধার থেকে জগত ডেকে নিয়ে এলো তখন ওর সঙ্গে বর্ষা কী করে এল। ওই ভোর রাতে বর্ষা ভাসানের সঙ্গে বিলের ধারে গিয়েছিল। যে বর্ষা মুখ খুললেই শ্রোতার গায়ে জ্বালা ধরে, কোনও পুরুষকেই যে কাছে ঘেষতে দেয় না। সে অমন হরিণছানার মত ভাসানের পিছু পিছু এসে দাঁড়াল এখানে, একটা শব্দও মুখ থেকে বের করল না, ভাসান বুড়ির ঘরের দিকে চলে গেলে সেও পিছু নিল? জগতটা সঙ্গে গিয়েছে তার সঙ্গত কারণ আছে। ভাসান তাকে জগাপাগলা থেকে জগতে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কৃতজ্ঞ তো হবেই। কিন্তু বর্ষার এই পরিবর্তন সনাতনের একটুও ভাল লাগছে না। তোর চরিত্র যেমন ছিল তেমনই তো রাখা উচিত! মরতে হলে স্বধর্মে মরাই ভাল।

মাঠের ভিড় ফাঁকা হয়ে যেতেই সনাতনের মনে হল বর্ষার ব্যাপারে ওর বাবাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। এতদিন মেয়েকে নিয়ে কম জ্বলেনি লোকটা। ওর যে পাত্রপক্ষ তাকে দেখতে এসেছে তারা একথার পর এগিয়ে দেওয়া মিষ্টির প্লেট স্পর্শ না করেই ফিরে গেছে। সবাই জেনে গেছে মেয়েটার আর

কখনও বিয়ে হবে না। অথচ মুখ না খুললে বর্ষা যে কোনও সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। এলাকার যে সব লাফাঙ্গা ছেলে মেয়েদের পেছনে ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায়, তারাও বর্ষার ছায়া মাড়ায় না।

বিপত্নীক সনাতন বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন যে গরু দুধ দেবে তার চাঁট তো সহ্য করতেই হয়। কিন্তু এখন নয়, আর একটু বেলা গড়াক, সময়টা আর একটু বাড়ুক, যখন বিয়ের বয়স সাধারণের চোখে পার হব হব, তখন না হয়ে ওর বাপের কাছে প্রস্তাবটা পাঠাবেন। এটা ঠিক, বয়সের পার্থক্যটা থেকেই যাবে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বড় স্বামী যদি যুবকের মতো আচরণ করতে পারে তাহলে পার্থক্যটা নিশ্চয়ই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

বর্ষার বাবা অত্যন্ত গোবেচারা মানুষ। চোর দুটোকে ছেড়ে না দিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তিনি খুশি। কিছুদিন ওরা চুরি করতে পারবে না, এটা তাঁর কাছে স্বস্তির কথা। মাঠ থেকে ফিরে স্ত্রীকে সবিস্তারে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলেন, সনাতনকে আসতে দেখে বললেন, 'সর্বনাশ, আমি আবার কী করলাম! আমার কাছে আসছে কেন?'

তাঁর স্ত্রী বলল, 'এগিয়ে গিয়ে কথা বল, নইলে ঘরে ঢুকে পড়বে।'

বারান্দায় বেরিয়ে বর্ষার বাবা বললেন, 'আসুন, কী সৌভাগ্য। বসুন।'

বারান্দায় একটা লম্বা বেঞ্চি পাতা ছিল, যার একটা পা ছোট বলে নড়বড় করে। সনাতন বসলেন, 'সাতসকালে কী জ্বালা বল ভাই।'

'তাতো বটেই। অনেকদিন পরে ভাসানের বাজনা শুনে গোটা রাত্তির ঘুমোতে পারলাম, সেটা যেন চোর দুটোর সহ্য হচ্ছিল না।' বর্ষার বাবা বললেন, 'ভাগ্যিস ভাসান এসেছিল নইলে মায়ের গায়ের সব গহনা চুরি করে নিয়ে যেত ব্যাটারা।'

'এইটে নিয়েই তো আমি ভাবছি।'

'কী রকম?'

'একটা যুবক যাকে আমরা চিনি না, কখনও দেখিনি, এখানে এসে একটার পর একটা উপকার করে যাচ্ছে কেন? মতলবটা কী?' সনাতন তাকালেন।

'ওসব জানার কি দরকার! সবাই বলছে ভাসান চাঁদের দেশের মানুষ। তাই ওর পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত তো কারও ক্ষতি করেনি,' বর্ষার বাবা বলল।

'চোখে দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে চোখের আড়ালে কিছু ঘটছে কি না জানি না।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না!' বর্ষার বাবা বললেন।

চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন সনাতন, 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় আপনার মেয়ের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

হকচকিয়ে গেলেন বর্ষার বাবা, 'বর্ষা, মানে আমি তো—, ওগো শুনছ, তুমি কি মেয়ের মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখতে পেয়েছ?'

ভেতর থেকে বর্ষার মায়ের গলা ভেসে এল, 'সে তো বাড়িতেই থাকছে না। টো টো করে ঘুরছে। দুবেলায় একবার এসে খেয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি কিছু বলনি?' বর্ষার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? ও মুখ খুললে গেছি আর কি।'

কথাটা শুনে বর্ষার বাবা মাথা নাড়লেন, 'এই মেয়েকে নিয়ে যে কী করি। বিয়ে হবেই না জেনে তো বিলের জলের ভাসিয়ে দিতে পারি না!'

সনাতন বললেন, 'ইয়ে, বিয়ে যে কখনওই হবে না এরকম ভাবা ঠিক নয়। আপনারা জানেন না, আমি লক্ষ্য করেছি। বর্ষা আগের মতো চেঁচামেচি করছে না। ওই ভাসান আসার পর থেকেই এটা হয়েছে।'

'তাই নাকি? ওঃ। ভাসান সত্যি চাঁদের দেশের মানুষ। আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে গোখরোকে সে হেলে সাপ করে দিয়েছে। এইবার যদি মেয়েটার একটা হিল্লে হয়।' বর্ষার বাবা কপালে হাত ছোঁয়ালেন।

'ভুল হচ্ছে, খুব ভুল হচ্ছে,' সনাতন বললেন।

'মানে?'

'মেয়েটাকে যদি বশ করে থাকে ভাসান তাহলে কী হতে পারে ভাবো।'

'কী হতে পারে?'

'কাল যদি শুনি ভাসান উধাও হয়ে গিয়েছে আর বর্ষাকেও পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে একটুও অবাক হব না।'

'একী বলছেন? চব্বিশ ঘণ্টায় এমন হওয়া অসম্ভব।'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই। বশীকরণ মন্ত্র সব কিছু করতে পারে।'

'বশীকরণ?'

'হ্যাঁ। নইলে ওর পেছন পেছন বর্ষা ঘুরবে কেন? একটা সোমত্থ মেয়ে অন্ধকারে বিলের ধারে ভাসানের সঙ্গে কী করছিল? বর্ষাকে যারা এতদিন জানে তারা কেউ ভাবতে পারবে? কিন্তু ঘটেছে। জগৎ মানে আমাদের জগা পাগলা ওদের সেখান থেকে ধরে নিয়ে এসেছে।'

সনাতনের কথা শুনে ভেতর থেকে বর্ষার মা বলল, 'ওকে বশ করে যদি পালিয়ে যায়? উঃ। তার চেয়ে তুমি এখনই গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দাও।'

সনাতন মাথা নাড়লেন, কথাটা উনি ভেবে চিন্তে বললেন না। ভাসানের বাড়ি কোথায়? সে কী কাজ করে? বাবা মা আছে কি না, এসব কথা না জেনেই বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে? যদি বলে আমার বাড়ি চাঁদের দেশে তাহলে বিশ্বাস করবে? সেখানে বর্ষাকে নিয়ে যাবে বলে অন্য শহরে নিয়ে যে বিক্রি করে দেবে না তার গ্যারান্টি কি আছে?

'সর্বনাশ।' শিউরে উঠলেন বর্ষার বাবা, 'বর্ষা এখন কোথায়?'

'আর কোথায়! ভাসান তো বুড়ির বাড়িতে। সেখানেই সে, আর একটা কথা, এখানে এত ভাল ভাল বাড়ি রয়েছে যেখানে ভাসান আরামে থাকতে পারত। কিন্তু তা না থেকে বুড়ির ভাঙাচোরা ঘরে গিয়ে উঠল কেন? বুড়ির ঘরের পেছনেই তো বিল, ইচ্ছে করলে সে যেমন সবার চোখের আড়াল দিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারে আবার তার কাছেও ওই পথ দিয়ে বাইরের লোক আসতে পারে।' সনাতন উঠে দাঁড়ালেন, 'যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন।'

বর্ষার বাবা বললেন, 'ছেলেটা এসে এলাকার মানুষের এত উপকার করল কেন? আমরা কেউই ঘুমাতে পারছিলাম না। সে বাজনা বাজিয়ে আমাদের চোখে ঘুম এনে দিল। সেই ছেলে কি বর্ষার ক্ষতি করতে পারে?'

সনাতন পা বাড়াতেই ভেতর থেকে বর্ষার মা বললেন, 'ওগো তুমি উনাকে নিয়েই বুড়ির ঘরে গিয়ে দ্যাখো।'

বর্ষার বাবা তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে সনাতনের পাশে এসে বললেন, 'আপনি সাথে থাকলে বড় ভরসা পাই। চলুন না!'

'আমি তো সবসময় আপনার পাশে আছি।' হাঁটতে হাঁটতে সনাতন বললেন, 'অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেল। একা একা থাকা যে কী কষ্টের! তাই আমি এলাকার মানুষের পাশে থেকে সময় কাটাতে চাই। চলুন।'

ওরা বুড়ির বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল ভাসান আর জগত দাওয়ায় বসে মুড়ি খাচ্ছে। বুড়ি বা বর্ষা কাছে পিঠে নেই।

ভাসান খাওয়া থামিয়ে হাসল, 'আসুন আসুন। এঁকে ঠিক ...। অবশ্য মাত্র একদিনে কত মানুষকে আর চেনা যায়।'

জগত বলল, 'বর্ষার বাবা।'

'ওহো। নমস্কার!' হাত জোড় করল ভাসান।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বর্ষার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বর্ষা কোথায়?'

জগত বলল, 'বিলের ধারে ঘাস কাটতে গেছে। দাদা নিষেধ করেছিল, শুনল না। দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।'

সনাতন চেঁচিয়ে বলল, 'এ্যাঁ! একি শুনছি!'

ভাসান বলল, 'যাক। নিষেধ করেছিলেম। বলেছিলাম আমি আর জগত গিয়ে ঘাস কেটে আনছি। শুনে বলল, মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি ঘরে বসে থাকব? তোমরা আজ আরাম করো, আমি যাচ্ছি।'

বর্ষার বাবা বললেন, 'কী কান্ড! যে মেয়ে, সংসারের কোনও কাজ করতে চাইত না সে গেছে ঘাস কাটতে। সেই ঘাস নিশ্চয়ই বিক্রি করে চাল ডাল কিনবে! মেয়ের এত পরিবর্তন!'

ভাসান জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ভাল না মন্দ, আপনি কি বলেন?'

সনাতন বললেন, 'আমার খারাপ লাগছে। যে মেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সংসার করবে সে গেল ঘাস কাটতে? ছিঃ।'

ভাসান বলল, 'আপনি যা বললেন তাহলে খুব ভাল হয়। শুনেছি বর্ষার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়নি, আপনার সন্ধানে আছে নাকি?'

বর্ষার বাবা বললেন, 'কোথায় পাব বাবা? আমার কপাল যে খুব খারাপ।'

'সে কথা শুনেছি কিন্তু, উনি যে বললেন, পায়ের ওপর পা তুলে সংসার করতে পারত বর্ষা, ওঁর নিশ্চয়ই সেরকম কোনও সম্বন্ধের কথা জানা আছে।' ভাসান হাসি মুখে বলল।

'চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার তো ফল পাওয়া যাবেই। বর্ষার মতো সুন্দরী মেয়ের পাত্র পাওয়া যাবে না তা আমি বিশ্বাস করি না। অবশ্য তাই বলে বিদেশ বিভুঁইয়ে অজানা পাত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই বিয়ে দেওয়া যাবে না।' বর্ষার বাবার দিকে তাকালেন সনাতন। 'তোমার মেয়ে ঘাস কাটতে গিয়েছে ভাবতে পার?'

'না পারি না' মাথা নাড়লেন বর্ষার বাবা।

সনাতন বললেন, 'জগা, মানে জগত, এক কাজ করো। বর্ষাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। বলবে তার বাবা তাকে

ডাকছে।'

মুড়ি খাওয়া ছেড়ে জগত চলে গেলে ভাসান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের এখানে ওর উপযুক্ত পাত্র নেই?'

বর্ষার বাবা বললেন, 'ছিল। কয়েকজন ছিল। কিন্তু ওর ওই মুখের জন্য তারা অন্যত্র বিয়ে করে ফেলেছে। যারা বিয়ে করেনি তারা ওর সমবয়সী।'

সনাতন বললেন, 'সমবয়সীর সঙ্গে বিয়ে হলে পরে সুখের হয় না।'

ভাসান মাথা নাড়ল, 'একটু বেশি বয়স দশ বারো বছরের কেউ নেই?'

বর্ষার বাবা বললেন, 'নাঃ। সবাই বিবাহিত'

'সেটাই স্বাভাবিক।' ভাসান বলল, 'তবে বিপত্নীক কেউ থাকলে।'

'কী বলছ বাবা?' বর্ষার বাবা বললেন, 'দোজবরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব? মেয়েও কি রাজি হবে?'

সনাতন বললেন, 'তোমার আপত্তি থাকতে পারে, তবে মেয়ের আছে কি না জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।'

ভাসান বলল, 'দেখুন এটা আমার সমস্যা নয়, আপনাদের। কিন্তু আমি যে অদ্ভুৎ সমস্যায় পড়েছি।'

'সেটা কী রকম?' সনাতন সন্দিগ্ধ।

আসুন তো।' ভাসান উঠে দাঁড়ালে সনাতন অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করল ভাসান। বলল, 'বেশ চঞ্চল। মনে হচ্ছে, প্রেশার বেড়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে যান।'

বুকে হাত রাখলেন সনাতন, 'দূর। আমি ঠিক আছি।'

বুক থেকে সনাতনের হাত সরিয়ে সেখানে নিজের হাত রাখল ভাসান, 'ছিলেন না এখন ঠিক হলেন।'

সনাতন হাসলেন, 'কিন্তু বাবা, তুমি চলে যেতে চাইলে আমরা যেতে দেব কেন? কত উপকার করেছ আমাদের। তুমি থাকলে ভরসা পাব। কী বল?'

বর্ষার বাবার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন সনাতন। তিনি কি বলবেন বুঝতে পারছিলেন না। ভাসান বলল, 'আপনি খুব ভাল মানুষ।'

'তুমিই কথাটা বললে বাবা। কিন্তু আমি যে খুব একা তা কেউ বোঝেই না।

'সত্যি তো। কিন্তু আপনি আবার বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে? কে আমার মতো দোজবরকে মেয়ে দেবে? একটু আগে ওর মুখে শুনলে তো। নিজের মুখে বলতে লজ্জা লাগে।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হত সে পায়ের ওপর পা তুলে আরামে থাকতে পারত। তাই না?'

'একশবার! আমার সব কিছু তার নামে লিখে দিতাম।'

ভাসান বলল, 'আপনি যা বললেন তাহলে খুব ভাল হয়। শুনেছি বর্ষার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়নি, আপনার সন্ধানে আছে নাকি?'
বর্ষার বাবা বললেন, 'কোথায় পাব বাবা? আমার কপাল যে খুব খারাপ।'

'আপনাদের জগতে এসে অনেক ভালবাসা পেলাম। একটা গোটা দিন থেকে গেলাম। এখন অন্য জায়গায় যাওয়া দরকার। কিন্তু একজন আমাকে তাঁর স্নেহে বেঁধে রাখতে চাইছে, অন্যজন কাছছাড়া হতে চাইছে না। প্রথম জনকে ভাবছি সঙ্গেই নিয়ে যাব।' ভাসান বলল।

'এ্যাঁ? কাকে?' সনাতন চমকে উঠলেন।

'এই বুড়ি মাকে। ওঁর তো তিনকুলে কেউ নেই। ঘাস কেটে বিক্রি না করতে পারলে দিন চলবে না। আমার সঙ্গে গেলে ওঁর সুবিধাই হবে।'

স্বস্তি পেলেন সনাতন, 'তা ঠিক। তা ঠিক।'

বর্ষার বাবা বললেন, 'অন্যজন কে?'

'এই বর্ষা মেয়েটা ওকে আপনারা বোঝান। আমার চালচুলো নেই, বুড়ি মাকে নিয়ে গাছতলাতেও থাকতে পারি। সঙ্গে গেলে ও কোথায় থাকবে?'

'না না, একদম না। ওকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাবে না।' সনাতন বললেন।

'আমার মনের কথা বললেন আপনি।' ভাসান জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনি সর্বাঙ্গীন সুস্থ আছেন তো?'

'কেন? আমাকে দেখে কি অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আপনার মনে ঝড় উঠেছে। একটু এদিকে

বর্ষার বাবা এবার কথা বললেন, 'কী হয়ে গেল? আমরা এখানে এলাম যে উদ্দেশ্যে সেটা কি মনে নেই?'

এই সময় বর্ষা এসে বিনীত গলায় বলল, 'আমায় ডেকেছ বাবা?'

'তুই ঘাস কাটছিলি? আমার মেয়ে হয়ে? ছিঃ।'

সনাতন বললেন, 'আহা। বকছ কেন? সখে পড়ে একদিন না হয় ঘাস কেটেছে। বুড়ির উপকার করেছে।'

'আশ্চর্য। আপনি এমন পাল্টি খেয়ে গেলেন কেন?' বর্ষার বাবা না বলে পারলেন না। 'আসার আগে ভাসানকে কত গালাগাল দিলেন?'

'ওটা স্নেহ করে বলেছি তা বর্ষা, ভাসানবাবা এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। আজ না হয় কাল তো তোমার বিয়ে হবেই। তখন সে থাকবে না তা কি তুমি চাও?' সনাতন বললেন।

বর্ষা আড় চোখে ভাসানকে দেখে ঠোঁট মোচড়ালো। তারপর লাজুক গলায় বলল, 'যাই, কাজ ফেলে এসেছি।' বলে দৌড়ে চলে গেল।

সনাতন শ্বাস ফেললেন, 'কী ভাল মেয়ে। বাঃ।'

ভাসান বলল, 'চলুন, আমরা সবাই মিলে ঘাস কাটা দেখতে যাই। মেয়েটা এত ভাল যে বেশিক্ষণ চোখের আড়াল করতে একদম ইচ্ছে করে না। বলুন।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে

অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চার সারা বিশ্বের কাছে বিরাট এক সমস্যা। অথচ মাত্র একটা পিলের মাধ্যমেই এই গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করা যায়। বিবাহিত হোন কিংবা অবিবাহিত, যে কোনও মহিলারই-এর প্রয়োজন হতে পারে যে কোনও সময়ে। তাই নিজেদের বিপদমুক্ত রাখার জন্য, প্রতিটি মহিলার এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কখন এর ব্যবহার করতে হবে, কী কী সমস্যা হতে পারে, কেনই বা ব্যবহার করবেন, কাদের সমস্যা হতে পারে, কাদের জন্য এই পিল উপযুক্ত নয় ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায়**

অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ রুখতে এমারজেন্সি পিল

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন বলতে ঠিক কী বোঝায়?

কোনওরকম গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করেই যদি কোনও নারী-পুরুষ সহবাস করেন তাহলে প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করার জন্য যে পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় তাকেই বলা হয় এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন বা ই সি। এই পিলকে মর্নিং আফটার পিলও বলা হয়। যদিও পিল ছাড়া এক ধরনের ডিভাইসের মাধ্যমেও গর্ভসঞ্চার আটকানো যায়। একে বলে ইন্ট্রা ইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস। এই পদ্ধতি 'কয়েল' (COIL) নামেও পরিচিত।

কখন প্রয়োজন হয় এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশনের?

- যদি কোনও মহিলা ও পুরুষ কোনওরকম গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা ছাড়াই যৌন মিলনে লিপ্ত হন অথবা
- যদি গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ না করে। যেমন কন্ডোম ফেটে যায় অথবা ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিয়মমতো খেতে ভুলে গেলে অথবা
- জোরপূর্বক কাউকে ধর্ষণ করলেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল আসলে কী

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিলে থাকে মূলত প্রোজেস্টেরন হরমোন। ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পাওয়া যায়। Suvida72 একটি এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল। সমস্ত ওষুধের দোকানে এটি পাওটা যায়। সাধারণত একটা পিলে থাকে ১.৫ মিগ্রা লিভো নরজেস্ট্রিল। কারও কারও একটু বেশি ডোজেরও দরকার হয়। বিশেষ করে যাঁরা এপিলেপসির ওষুধ খান তাঁদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই পিল সঠিক ডোজে ব্যবহার করা উচিত।

কখন খেতে হবে

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে যৌনমিলন হওয়ার পর যত দ্রুত এই পিল খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কারণ পিল খেতে যত দেরি হবে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কাও তত বাড়বে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তো অবশ্যই খেতে হবে। দেখা গিয়েছে, যৌন মিলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পিল খেলে শতকরা ৯৫-১০০ ভাগ, ২৫-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খেলে শতকরা ৮৫-১০০ ভাগ এবং ৪৯-৭২ ঘণ্টার মধ্যে খেলে ৫৮-১০০ ভাগ প্রেগন্যান্সি প্রতিরোধ করা সম্ভব। অনেকে ৭২-১২০ ঘণ্টার মধ্যেও খান। সেক্ষেত্রেও গর্ভরোধ করা সম্ভব। তবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়াই নিরাপদ।

পিল কীভাবে কাজ করে

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল যেভাবে কাজ করে তা হল, সাময়িকভাবে ডিম্বাণু নিঃসরণে বাধার সৃষ্টি করে। কিংবা ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিলনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। অথবা নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে।

এর কোনও সাইড এফেক্ট আছে কী?

সাধারণত সাইড এফেক্টস তেমন কিছু থাকে না। যদিও কারও কারও পিল খাওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত একটু দুর্বলতা থাকে। কারও কারও বমিও হয়। তবে খাবার দাবার ঠিকমতো খেলে খুব একটা সমস্যা হয় না। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে তলপেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি, স্তন ভার লাগার সমস্যা হতে পারে। এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আবার আপনা আপনিই এসব ছোটখাট সমস্যা দূর হয়ে যায়।

বমির সঙ্গে যদি পিল বেরিয়ে যায় তাহলে কী করতে হবে?

পিল খাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে বমি হলে পিল বেরিয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার একটা পিল খেতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টি সিকনেসের ওষুধও খাওয়া যেতে পারে। পিল হজম করতে একান্তই অসুবিধা হলে তখন ইন্ট্রা ইউটেরাইন ডিভাইসের সাহায্য নিতে হবে প্রেগন্যান্সি আটকানোর জন্য।

ডিভাইসের কাজ কী

ডিভাইসটি জরায়ুর ভেতরে বসিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্যই চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। ডিভাইসটি থেকে ক্রমাগত প্রোজেস্টেরন হরমোন বেরতে থাকে। এই হরমোনই শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে বাঁধার সৃষ্টি করে প্রেগন্যান্সি আটকায়। এক্ষেত্রে সাফল্যের হার শতকরা ১০০ ভাগ। কপার-এ অ্যালার্জি কিংবা হার্টে ইনফেকশন যাকে বলে এন্ডোকার্ডাইটিস থাকলে এটি ব্যবহার করা যায় না।

কারা এই পিল খেতে পারবে না?

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল

যদি আগেই প্রেগন্যান্ট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই পিল কখনই খাওয়া উচিত নয়। কিছু লিভারের অসুখ কিংবা সিভিয়ার অ্যাজমা থাকলেও এই পিল খাওয়া চলবে না। কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খেলে এই পিল খাওয়া উচিত নয়। হজমের কিংবা হার্টবার্ন-এর ওষুধও এই পিলের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। কাজেই প্রোজেস্টেরন পিল নিজে কিনে খাওয়া গেলেও ইউলিপ্রিস্টাল অ্যাসিটেট ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া দরকার।

পিল কি পুরোপুরি নিরাপদ

প্রায় সব মহিলার জন্যই এটি নিরাপদ পদ্ধতি। কিছু ক্ষেত্রে, যদি পরফিরিয়া (PORPHYRIA) থাকে তাহলে এই পিল একেবারেই খাওয়া চলবে না।

ইউলিপ্রিস্টাল অ্যাসিটেট পিলও কি একই রকমভাবে গর্ভসঞ্চার আটকাতে সক্ষম?

অবশ্যই। এর একটা মাত্র ডোজই যথেষ্ট গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করার জন্য। এই পিলও অসতর্ক সহবাসের পর আপৎকালীন ভিত্তিতে খেতে হয়। ৫ দিনের পরে খেলে তেমন কাজ নাও হতে পারে। এই পিল ডিম্বাণু নিঃসরণকেই সাময়িকভাবে প্রতিহত করে অথবা দেরিতে নিঃসরণ করে। এছাড়া জরায়ুর লাইনিং তৈরিতেও ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ নানাভাবে প্রেগন্যান্সি আটকাতে সাহায্য করে। তবে নিয়মিতভাবে এই পিল খাওয়া কখনওই উচিত নয়।

ইউলিপ্রিস্টাল পিল এর সাইড এফেক্টস আছে কি

তেমন একটা নেই। তবে কারও কারও মাথাব্যথা, দুর্বলতা, তলপেটে ব্যথা কিংবা অনিয়মিত ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং হতে পারে।

পিল খাওয়ার পরেও গর্ভ সঞ্চার হতে পারে কি

পিল খাওয়ার পরেও গর্ভসঞ্চার তখনই হতে পারে যখন

- প্রোজেস্টেরন পিল অসতর্ক সহবাসের ৭২ ঘণ্টা পরে খাওয়া হয় বা ইউলিপ্রিস্টাল পিল খাওয়া হয় ১২০ ঘণ্টা পর।
- যদি পিল খাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে কারও বমি হয় এবং দ্বিতীয় পিল না খাওয়া হয়।
- যদি এর আগেও অসতর্ক সহবাস হয়ে থাকে।
- যদি কন্ট্রাসেপটিভ পিল একবার খাওয়ার পর আবারও একইভাবে যৌনমিলনে লিপ্ত হয় তাহলেও।

এই পিল কি মহিলাদের স্বাভাবিক পিরিয়ডে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে

বেশিরভাগ সময়েই করে না। তবে কারও কারও পিরিয়ড ২-৪ দিন এগিয়ে বা পিছিয়ে হতে পারে। যদি কারও ৭ দিনের বেশি পিছিয়ে যায় তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে প্রেগন্যান্সি টেস্টও করাতে হতে পারে।

কারও স্বাভাবিকের থেকে ২-১ দিন বেশি বা কম দিন পিরিয়ড স্থায়ী হতে পারে।

এছাড়া সামান্য ক্ষেত্রে হলেও কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারের পরে প্রেগন্যান্সি আসতে পারে।

মনে রাখতে হবে, এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন ব্যবহারের পর কারও যদি তলপেটে ব্যথা হয় অথবা ২-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। এই ধরনের উপসর্গ একটোপিক প্রেগন্যান্সির জন্য হতে পারে। যদিও এর আশঙ্কা খুব কম ক্ষেত্রেই থাকে।

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল কতবার ব্যবহার করা যায়

পিল এর নামের মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে যে এমার্জেন্সিতেই এই পিল ব্যবহার করতে হবে। এটা নিয়মিত জন্মনিরোধক বড়ি হিসেবে খাওয়া কখনওই উচিত নয়। কিংবা এই পিল খেয়ে সহবাসে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়।

ব্রেস্ট ফিড করানো মহিলারা কি এই পিল খেতে পারেন?

অবশ্যই পারেন। এমন কোনও তথ্য প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যে এই পিল মা কিংবা সন্তানের জন্য কোনওভাবে ক্ষতিকর।

এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিলের জন্য কি অ্যাবরশন হতে পারে

এই পিল গর্ভসঞ্চার প্রতিরোধ করে। কোনওভাবে অ্যাবরশন বা গর্ভপাত ঘটায় না। একবার জরায়ুতে ভ্রূণ গঠিত হলে তাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এই পিলের নেই।

পিল খাওয়ার পরেও কেউ প্রেগন্যান্ট হলে সেই সন্তানের কি শারীরিক ত্রুটির আশঙ্কা থাকে?

একেবারেই না। এমন কোনও প্রমাণ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।

কথা ও কাহিনি ৪

সবার আগে মা

রূপক সাহা

শিকরাবাদ থানার বারান্দায় বসে আছে সোনামণি। কখন দারোগাবাবুর ডাক আসবে সেই প্রতীক্ষায়। দোলা দিদিমণি অনেকক্ষণ আগে দারোগাবাবুর ঘরে ঢুকে গিয়েছে। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছে, 'তোকে যা শিখিয়ে দিয়েছি, বড়বাবুর কাছে গিয়ে ঠিক সেই কথাগুলোই বলবি। মনে থাকবে তো? মনে না থাকলে বল, আবার বলে দিচ্ছি। দেখিস, ভেতরে ঢুকে আমায় ডোবাস না যেন।'

বাচ্চাটা কোলে আসার পর থেকেই দোলা দিদিমণি ওর পিছনে লেগে রয়েছে। 'মধু সোরেনকে একটা লেসন দিতে হবে, বুঝলি। বাস্টার্ডটাকে আমি জেলের ঘানি টানাব। একটা অসহায় মেয়েকে রেপ করা! তুই আমার সঙ্গে থানায় চল সোনামণি। তারপর ওকে মজা দেখাচ্ছি।'

কথাগুলো যখন বলে, তখন দোলা দিদিমণির সোন্দর মুখটা লাল হয়ে যায়। নাকের পাটা ফুলে ওঠে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে থাকে। মধুবাবুর উপর দোলা দিদিমণির কেন এত রাগ, সোনামণি সেটা বুঝতে পারে না। লেসন, বাস্টার্ড, রেপ—কথাগুলোর মানে ও জানে না। ও তখন ফ্যালফ্যাল চোখে দোলা দিদিমণির দিকে তাকিয়ে থাকে

শিকরাবাদ পার্টি আপিসের কাছে কলাবনী গাঁ। সেই গাঁয়েরই মেয়ে এই সোনামণি। বয়স উনিশ-কুড়ি বছর। কিন্তু এখনই পূর্ণ যুবতী। গেল বছর জনমজুরি খাটতে বাপ-মায়ের সঙ্গে পুবের দেশে গিয়েছিল। মাস তিনেক পর একাই সেখান থেকে ফিরে এল। গাঁয়ের লোক জিজ্ঞেস করে, তুর বাপ কই রে? মা গেল কুথায়? কিন্তু সোনামণি রা কাড়ে না। কেমন যেন জুবুথুবু হয়ে

গিয়েছিল মেয়েটা। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, যেখান থেকে জঙ্গল শুরু, সেখানে একাই থাকত সোনামণি। বাস স্ট্যান্ডের ধারে মধু সোরেনের গুড়ের কারখানায় টুকটাক কাজ করে পেট চালাত অ্যাদ্দিন।

হঠাৎ গাঁয়ের লোকেদের চোখে পড়ে, সোনামণির তলপেট ভারী। অবিবাহিতা মেয়ের পেট হওয়ার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি কলাবনী গ্রামে। প্রথম দিকে গাঁয়ের লোকেরা ফিসফাস করত। তারপর একদিন মোড়ল মিটিং ডেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'কে তুর পেট করিনছে, বল বটে বিটি। তুর সানথে বিয়া দুব।' তবু সোনামণি কোনও উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে থাকে। শুধু চোখের জল ফেলে। সোনামণির ঘরের অল্প দূরেই পানমণিদের বাড়ি। ওর শাশুড়ি ঠাকুরমণির বয়সের গাছ পাথর নেই। কিন্তু বুড়ির চারদিকে নজর। গাঁয়ের কার বাড়িতে কে যাতায়াত করে, সব খবর বুড়ির নখদর্পণে। মিটিংয়ে মোড়লকে সে জানায়, রেতের বেলায় মধু সোরেনকে একদিন সোনামণির ঘরে ঢুকতে দেখেছে। মধু লেখাপড়া জানা লোক। পঞ্চায়েত সমিতির লড়াকু নেতা। অযোধ্যা পাহাড়ে ওকে একবার মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল মাওবাদীরা। কিন্তু পারেনি। বাপের দুবিঘে জমিতে আখের খেত করেছে। গুড়ের কারখানাও চালায়। অফ সিজনে শুয়োর চাষ করে, ব্যবসাটা বেশ লাভজনক বলে। এক একটা শুয়োর আড়াই-তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়। ওর খোঁয়াড় গুড়ের কারখানার ঠিক পিছনেই। মধুকে মিটিংয়ে ডেকে আনে কার সাধ্য! ফলে মোড়ল ওখানেই মিটিং ভেঙে দেয়।

কিন্তু বাবারও তো বাবা থাকে। সোনামণি বাচ্চাটার জন্ম দেওয়ার পরই আসরে নামে আদিবাসী বিকাশ সমিতি। তাদের পিছন থেকে মদত দেয় পুরুলিয়ার এক এনজিও, যার সেক্রেটারি দোলা সেন। শিকরাবাদে একবার মিটিং করতে এসে সোনামণির দুরবস্থার কথা শোনেন দোলা সেন। শুনে লোক মারফত ডেকে পাঠান ওকে। বলেন, 'আমাকে সব খুলে বল সোনামণি। এ তো পরিষ্কার থ্রি সেভেন্টি সিক্স। মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় বছর কনভিকশন হয়ে যাবে মধু সোরেনের। আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া! দেখাচ্ছি মজা।'

দোলা সেনের উত্তেজনা দেখে বিন্দুমাত্র হেলদোল হয় না সোনামণির। ও কোনও কথা বলে না। থ্রি সেভেন্টি সিক্স, মিনিমাম, কনভিকশন—এই সব কথা ও বুঝতে পারে না। শুনতে শুনতে বাচ্চাটাকে ও কোলে আঁকড়ে ধরে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে দোলা দিদিমণির দিকে। তারপর কোলের বাচ্চাটার দিকে তাকায়। সন্ধের পর মারাত্মক ঠান্ডার কথা ভেবে ও আতঙ্কিত হয়। ঘরে যে দরজা পর্যন্ত নেই! রাতে হু হু করে ঠান্ডা বাতাস ঢোকে। মাটির মেঝেটাকে যেন সাপের শরীর বলে মনে হয়। বাচ্চাটার কষ্ট দেখে সোনামণির বুক তখন কেঁপে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত একদিন গাঁয়ের মোড়লের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না সোনামণি। মোড়ল বাবার সঙ্গেই ও এনজিও অফিসে যায়। মেঝেয় বসে বাবুদের কথাবার্তা শুনতে থাকে। দোলা দিদিমণির সঙ্গে শলাপরামর্শ হচ্ছে। মন্টু মাহাতোকে দোলা দিদিমণি বলছে, সোনামণিকে থানায় নিয়ে যাওয়ার আগের দিন তোমাদের এখানে মোর্চা বের করতে হবে। গাঁয়ের মেয়েরাও যেন সেই মিছিলে থাকে। সবার হাতে একটা করে পোস্টার ধরিয়ে দিতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, 'রেপিস্ট মধু সোরেন জবাব দাও,' 'গাঁয়ের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করা চলবে না,' 'কলাবনীর কলঙ্ক মধু সোরেন'। সারা গাঁ ঘুরে সেই মিছিল যাবে শিকরাবাদ থানায়। একেবারে প্ল্যান করে সব করতে হবে, বুঝলে মন্টু। শহর থেকে আমি টিভি চ্যানেলের লোকদের ডেকে আনব। টিভিতে একেবারে হইচই বাঁধিয়ে দেব আগের দিন। যাতে দারোগাবাবুর টনক নড়ে। দেখি, বাস্টার্ডটাকে কে বাঁচায়।'

মন্টু

মাহাতো বলে, 'মধু কঠিন লোক বটে। টাকার অভাব লাই। দারগাবাবু...'

'টাকা খেতে পারে, এই তো? সে রাস্তা আমি মেরে দেব।' মন্টু মাহাতোকে চুপ করিয়ে দেয় দোলা দিদিমণি। কথাটা বলার সময় ঠোঁট বেঁকে যায়। মধু সোরেনকে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন এনজিও অফিসে। কিন্তু সে আসেনি। উল্টে বলেছে, 'মেয়ে ছেইল্যাটাকে পঞ্চাত আপিসে আসতে বল বটে। আমি যাবক লাই।'

শুনে দোলা দিদিমণির রাগ আরও বেড়ে যায়। 'ঠিক আছে, মধুকে বলে দিস। শেষ দেখাটা হবে, ও যখন পুরুলিয়ার জেলে গিয়ে ঢুকবে।' কথাটা বলেই সোনামণির দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফের বলে, 'আমার ভয় হচ্ছে এই বোকা মেয়েটাকে নিয়ে। কমপ্লেন আমি করলে তো পুলিশ নেবে না। এই মেয়েটাকেই করতে হবে। থানায় গিয়ে ও যদি ঠিকঠাক বিহেভ না করে, তা হলে আমার কিছু করার নেই।'

দোলা দিদিমণির কথামতো মোড়ল বাবা শিকরাবাদ থানায় এনেছে সোনামণিকে। ওদের সঙ্গে এসেছে পানমণিও। সকাল নটার সময় ওরা থানায় পৌঁছেছে। এখন বেলা একটা বাজে। বারান্দায় বসে থাকার সময় একটু আগে বাচ্চাটা খুব কাঁদছিল। আপিস ঘর থেকে একজন পুলিশ এসে খুব জোরে ধমক দিয়েছে সোনামণিকে, 'এই বাচ্চাটাকে অন্য কোথায় নিয়ে যা তো। বুঝি না বাপু, খেতে দিতে পারিস না, কেনই বা তোদের বাচ্চা হয়!'

পুলিশের ভয়ে বাচ্চাটাকে ওর কোল থেকে তুলে নিয়ে গেছে পানমণি। দূরে গাছতলার ছাওয়ায় বসে নিজের বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বুকটা মুচড়ে উঠল সোনামণির। ওর স্তনবৃন্ত দুটো টনটন করতে লাগল। বাচ্চা বিয়োনোর পর থেকে স্তন দুটো ভারী হয়ে গিয়েছে। পানমণি ওকে তখনই বলেছিল, এ রকম নাকি হয়। আপনা আপনি দুধ বেরিয়ে আসে। একটু পরেই সোনামণি বুঝতে পারল, ব্লাউজের সামনের দিকটা ভিজে গিয়েছে। যাতে কারও চোখে না পড়ে, সেজন্য ও আঁচল টেনে ঢাকল।

সকালে পান্তা ভাতটাও ভাল করে খেয়ে আসতে পারেনি সোনামণি। ওকে এমন তাড়া মারছিল পানমণি। এখন খিদের জ্বালা টের পাচ্ছে। অন্য দিন, গুড়ের কারখানায় আখ মাড়াইয়ের কাজ করতে করতে বেলা পেরিয়ে যায়। মধু সোরেনের বলাই আছে। উল্টো দিকের পাইস হোটলে গিয়ে তখন সোনামণি ডাল-ভাত খেয়ে আসে। নিজে খাওয়ার পর বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর লক্ষ রাখে, যাতে ডেঁয়ো পিঁপড়ে কামড়ে না দেয়। গুড়ের কারখানায় পিঁপড়ে, মৌমাছির খুব উৎপাত। দুকুরের আগেই আখ মাড়াইয়ের কাজটা হয়ে যায় কারখানায়। তারপর শুরু হয় রস জ্বাল দেওয়া। সেই সময় ওর কোনও কাজ থাকে না। সোনামণি নিজেও খানিকটা সময় গড়িয়ে নেয়।

থানার বারান্দায় বসে আজ ওর শরীর সেই কারনেই ঢিসঢিস করছে। ইচ্ছে করছে, আঁচল বিছিয়ে খানিকটা সময় জিরিয়ে নেয়। কিন্তু বারান্দা দিয়ে অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। শুয়ে পড়লে পুলিশ ওকে তুলে দেবে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সোনামণি তাই চোখ বন্ধ করল। থানা থেকে কখন বেরতে পারবে কে জানে? থানা-পুলিশ খুব বাজে জায়গা। অন্তত ওর অভিজ্ঞতা তাই বলে। জীবনে আর একবারই ও থানায় গিয়েছে। কেশবগঞ্জের পুলিশই ওকে নিয়ে গিয়েছিল বর্ধমান হাসপাতালের মর্গে। বাপ আর মায়ের মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য। নতুন আবাসন তৈরি হচ্ছিল তখন কেশবগঞ্জে। বাপ-মায়ের সঙ্গে জনমজুরি খাটতে গিয়েছিল সোনামণি। ছাদ ঢালাইয়ের সময় বিপত্তি। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সব। আবাসনের ঝুপড়িতে তখন রান্না করছে সোনামণি। তাই বেঁচে যায়।

পুলিশই লাশ দুটোর সৎকার করেছিল। রাতে ঝুপড়িতে ফিরে আসে সোনামণি। বাপ-মা হারানোর আঘাতে কথা বলার ক্ষমতাও তখন ওর নেই। মাঝরাতে চুপিসাড়ে ভাম ঢুকেছিল ওর ঝুপড়িতে। মানুষের বেশে ভাম। অন্ধকারে মুখ চেপে ধরে বলেছিল, 'চোপ...চেঁচালে মুন্ডু আলাদা করে দেব।' শ্বাসে চোলাইয়ের গন্ধ। গা গুলিয়ে উঠেছিল সোনামণির। গলার স্বরে শয়তানটাকে ও চিনতে পেরেছিল। মহাদেব মাল... হেড মিস্তিরির পেয়ারের লোক। সোনামণি যখন মাথায় ইট বয়ে নিয়ে যেত, তখন লোকটা জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকত ওর বুকের দিকে। শয়তানটা ওর শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল সেই রাতে। ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল ওর যৌনাঙ্গ। ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শাসিয়ে গিয়েছিল, 'কাল ভোরেই তুই দেশে ফিরে যাবি। এসব কথা কাউকে বললে তোকে টুকরো টুকরো করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেব।'

না, কাউকে এ কথা বলেনি সোনামণি। সূর্য ওঠার আগেই, চোখের জল মুছে ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিল বাস স্ট্যান্ডে। ওখানেই মধু সোরেনের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। 'তুর বাপ-মা কই বটে?' প্রশ্ন করেছিল মধু সোরেন। উত্তর না দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সোনামণি। কী বুঝেছিল মধু সোরেন, কে জানে? আর কোনও কথা জানতে চায়নি। বাসে ওকে লেডিস সিটে বসিয়ে দিয়ে, নিজে ঠিক পিছনের সিটে বসেছিল। শুধু তাই নয়, বাস শিকরাবাদ পৌঁছনোর পর ভ্যান রিকশা করে ওকে কলাবনী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল মধু সোরেন। পুবের দেশে রওনা হওয়ার সময় ঘরের চারপাশে কাঁটা ঝোপের আড়াল দিয়ে গিয়েছিল সোনামণির বাপ। যাতে ঘরটা বেদখল হয়ে না যায়। সেই ঝোপ সরিয়ে দেওয়ার পর... যাওয়ার সময় মধু সোরেন শুধু বলে গিয়েছিল, দরকার হলে ফের ওর কাছে যেতে।

মধু সোরেন মানুষ লয়, দ্যাবতা। মারাংবরু ঠিক সময়েই পাঠিয়ে দিয়েছিল ওর কাছে। থানার বারান্দায় বসে সোনামণি মনে মনে বলল, না না, মধু সোরেনের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারবে না। মানুষটা ওর অনেক উপকার করেছে। দু-বেলা দু-মুঠো যা হোক, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কুনওদিন কুচোখে ওর দিকে তাকায়নি। কুনওদিন জিজ্ঞেসও করেনি, পেটে বাচ্চা এল কী করে? উল্টে, বাচ্চা হওয়ার রাতে গাঁ থেকে দাই নিয়ে গিয়েছিল। মধু সোরেন পাশে এসে না দাঁড়ালে গাঁয়ের লোক এতদিনে ওকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে... হয়তো পিটিয়েই মেরে ফেলত। মানুষটার কথা ভাবার সময় কৃতজ্ঞতায় সোনামণির চোখে জল এসে গেল। শিকরাবাদের বেশিরভাগ লোক খুব মানে মধু সোরেনকে। দোলা দিদিমণির কথায় এই মানী লোকের অসম্মান কেন করবে ও? না, না সে কাজও করতে পারবে না।

মধু সোরেনের মুখ ওর চোখের সামনে ভাসছে। এমন সময় বুকের কাছে লাঠির খোঁচা খেয়ে চমকে উঠল সোনামণি। চোখ খুলে দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে উর্দিপরা পুলিশ। খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে। বলল, 'এই তোর নাম সোনামণি?'

ঘাড় নাড়ল সোনামণি। দেখে পুলিশটা বলল, 'যা, বড় সাহেব তোকে ডাকছে।'

ধীরে ধীরে সোনামণি উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, 'কুথাকে?'

লাঠি দিয়ে দিক নির্দেশ করল লোকটা, 'সোজা... ওই ঘরে।'

একটু পরে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই দারোগাবাবুকে দেখতে পেল সোনামণি। টাক মাথা, গোল মুখ, পেল্লাই গোঁফ। দারোগাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রয়েছেন ওর দিকে। দেখে বুকটা একবার কেঁপে উঠল সোনামণির। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে দোলা দিদিমণি। ওকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আয়, এদিকে আয়। এই হতভাগা মেয়েটার কথাই বলছিলাম মিঃ বাগচী।'

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়ে, দিদিমণিটা যা বলছে... ঠিক?'

দোলা দিদিমণি কী বলেছে, তা সোনামণি জানে না। ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে দোলা দিদিমণি নরম গলায় বলল, 'আমাকে যা বলেছিস, সাহেবের কাছে খুলে সব বল মা। তোর হয়ে আমি এই কমপ্লেন লেটার দারোগাবাবুর কাছে দিয়েছি। তুই খালি টিপসই দিয়ে দে। তারপর মধু সোরেনকে কে বাঁচায় আমি দেখে নেব।'

কমপ্লেন লেটার কী, সোনামণির মাথায় তা ঢুকল না। কিন্তু টিপসই বস্তুটা ও জানে। কেশবগঞ্জে ওই টিপসই দিয়েই রোজ মজুরির টাকা পেত। কেশবগঞ্জের কথা মনে হতেই মহাদেব

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দারোগাবাবু বললেন, 'আচ্ছা মুশকিল হল মিসেস সেন। ভিক্টিম যদি রেসপন্ড না করে, তাহলে লড়বেন কী করে? মধু সোরেনকে আমি অ্যারেস্ট করে আনতে পারি। কিন্তু তার পরের কনসিকোয়েন্স চিন্তা করুন। পার্টির লোকজন এসে থানা ভাঙচুর করবে। তারও পর কোর্ট তো আপনার কথা শুনবে না। সোনামণির কাছ থেকে সত্যি কথাটা জানতে চাইবে। ও যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে উল্টো কথা বলে, তা হলে তো আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।'

দারোগাবাবুর অর্ধেক কথাই সোনামণি বুঝতে পারল না। বাইরে থেকে ভেসে আসা বাচ্চার কান্নার ক্ষীণ শব্দ শুনে ওর মন গাছতলার দিকে। ওর আত্মজ, নাড়ি ছেড়া ধন। তাকে নিয়ে পানমণি বসে আছে। সোনামণির মনে হল, ছুটে গাছতলার দিকে চলে যায়। পানমণির কোল থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু উপায় নেই। পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে এলেন এক পুলিশ দিদিমণি। দারোগাবাবু তাঁকে বোঝাতে শুরু করলেন, কী জিজ্ঞেস করতে হবে।

ঘুরে ফিরে পুলিশ দিদিমণিরও সেই একই প্রশ্ন। যার উত্তর সোনামণির জানা আছে। কিন্তু বলার ইচ্ছে নেই। দারোগাবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে দোলা দিদিমণির। সহবাস ধর্ষণ, ডিএনএ...

হঠাৎ গাঁয়ের লোকেদের চোখে পড়ে, সোনামণির তলপেট ভারী। অবিবাহিতা মেয়ের পেট হওয়ার ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি কলাবনী গ্রামে। প্রথম দিকে গাঁয়ের লোকেরা ফিসফাস করত। তারপর একদিন মোড়ল মিটিং ডেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'কে তুর পেট করিনছে, বল বটে বিটি। তুর সানথে বিয়া দুব।'

মালের মুখটা ওর চোখের সামনে একবার ভেসে উঠল। অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ওই মুখটাকে সোনামণি ভুলতে পেরেছে। ফের লোকটার কথা ওর মনে পড়ছে কেন, ও বুঝতে পারল না। দারোগাবাবুর কাছে কি ও সত্যি কথাটা বলে দেবে? বললে ওই শয়তানটাকে কি পুলিশ ধরে আনতে পারবে? এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে ভাবার মাঝেই দারোগাবাবুর অসহিষ্ণু গলা ও শুনতে পেল, 'মিসেস সেন, আমার মনে হয়, আমার কাছে রেপ ইন্সিডেন্সের কথা বলতে মেয়েটা হেজিটেট করছে। আমার থানায় একজন লেডি এএসআই আছেন। মিস দুর্গা মুর্মু। দাঁড়ান, তাঁকে ডেকে পাঠাই। নিজের কমিউনিটির, হয়তো মেয়েটা ওর কাছে কমফর্ট ফিল করবে।' বলেই বেল বাজালেন দারোগা বাবু।

বেলের শব্দে মুখ তুলে সোনামণি দেখল, দারোগাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। দেখেই ওর পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই। কিন্তু বুঝতেও পারছে না, বসে পড়া উচিত হবে কিনা। মেঝেতে উবু হয়ে বসে পড়ার কথা ও যখন ভাবছে, তখন দারোগাবাবু বললেন, 'সব কথা বলার দরকার নেই। শুধু বল, মধু সোরেন কি তোর বাচ্চার বাপ?'

প্রশ্নটা শুনে ফের মাথা নিচু করল সোনামণি। কোনও উত্তর দিল না।

কথাগুলোর মানে ও বুঝতে পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। ওর কান গাছতলার দিকে। কান্নার শব্দটা কি ক্রমে বাড়ছে? কাঁদতে কাঁদতে কি বাচ্চাটা এতক্ষণে নীল হয়ে গিয়েছে? ও কেন এত কাঁদে সেটাই সোনামণি বুঝতে পারে না। ঘরে এক এক সময় সোনামণি নিজেই অবাক হয়ে যায়। সাংসারিক কাজকর্মের জন্য বাচ্চাটাকে ও যখন কোল থেকে নামায়, তখন ওর ওইটুকু শরীর থেকে, এত জোরে আওয়াজ বেরয় কী করে?

প্রশ্ন করতে করতে একটা সময় পুলিশ দিদিমণি হাল ছেড়ে দেন। ধৈর্যচ্যুত হন দারোগাবাবুও। বলেই ফেলেন, 'সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না মিসেস সেন। আমার অন্য কাজ আছে। লাস্ট টাইম একবার প্রশ্ন করে দেখি। মেয়েটা যদি কোনও উত্তরই না দেয়, তাহলে আপনিই বলুন ওকে জাস্টিস দেব কী করে? ... এই মেয়ে তুই থানায় এলি কেন? কী চাস, বল তো?'

এতক্ষণে মুখ খোলে সোনামণি। বিড়বিড় করে উত্তর দেয়। কানে পৌঁছয় না দারোগাবাবুর। বলেন, 'মেয়েটা কী বলছে, শুনে আমায় বলুন তো মিস মুর্মু।'

পুলিশ দিদিমণি উত্তর দেয়, 'আপনার কাছে ও একটা কম্বল চাইছে স্যার। রাতে ঠান্ডায় বাচ্চাটা খুব কষ্ট পায়। আপনি কি একটা কম্বলের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? আর একটা মশারির?'

কা ছে দূ রে

ব্যাংকক, পাটায়ায় শ্যুটিং করতে গিয়ে এই শহর দুটি কেমন জানাচ্ছেন অভিনেত্রী **পায়েল সরকার**

হ্যালো ব্যাংকক

আমরা যারা সিনেমায় অভিনয় করি তাদের একটা বদভ্যাস হয়ে যায়। সিনেমা-শ্যুটিং-এর দৌলতে আউটডোর করতে গিয়ে অনেক সময়ই দেশভ্রমণ হয়ে যায় বিনে পয়সায়। এই ঘোরার একটা আলাদা মজা আছে। আর এটাই হয়ে ওঠে অভ্যেস। কাজ তো আছেই, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘোরা, খাওয়া, মজা করা, বাজেট নিয়ে কোনও চিন্তা না করে ঘুরে বেড়ানো! আজকাল তো বাংলা সিনেমা আর শুধু রাজ্য ও দেশের গন্ডীতে আটকে নেই। আমি নিজে সিনেমার শ্যুটিং করতে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছি।

এই তো কিছুদিন আগেই গিয়েছিলাম থাইল্যান্ড। অর্থাৎ ব্যাংকক-পাটায়া। শুনেছি কলকাতা টু গোয়া যেতে যা খরচ, ব্যাংকক যেতেও একই খরচা। তবে ব্যাংকক যাবেন কেন তাই তো? কী আছে ওই শহরে।

আমি প্রথম যখন ব্যাংকক-এ পৌঁছই, প্রথমেই যেটা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল সেটা হল এখানকার স্থানীয়দের পোশাক আশাক। ব্যাংকক বা থাইল্যান্ডের অন্যতম শিল্প হল পর্যটন। তাই বোধহয় এ দেশের সাধারণেরাও অসাধারণ সেজে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে। অসাধারণ বলতে কিন্তু আমি ফ্যান্সি ড্রেসের কথা বলছি না, হাই ফ্যাশন-এর কথা বলছি। অসম্ভব ভাল, সুন্দর ফ্যাশনেবল পোশাক পরে এখানকার ছেলে মেয়েরা। মেন রাস্তায় একপাল শর্টস ও মিনি স্কার্ট পরা থাই মেয়েদের হেঁটে যেতে দেখে আমরা সবাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। অথচ এদের সেভাবে কেউ মোলেস্ট করে বলে তো মনে হল না। ওরা কেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্যই ব্যাংককে সেক্স-ট্যুরিজম একটা বড় আকর্ষণ। এখানকার ম্যাসাজ পার্লার, নাইট ক্লাব, বার, রেস্তরাঁ সব জায়গায়ই একটা অদম্য যৌন আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। কখনও তা চাপা, কখনও একেবারে অবাধ! কারও যেন তেমন মাথাব্যথা নেই কে কী করছে সে ব্যাপারে। তাই হট প্যান্ট পরে যদি কেউ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, সেটা অস্বাভাবিক নয়। নাইট ক্লাবে বহু সাধারণ মধ্যবিত্ত মনস্ক ট্যুরিস্ট, কিন্তু স্বল্পবাস ডান্সারদের নাচ দেখতে তেমন সংকোচ বোধ করে না। আসলে ব্যাংককে 'সেক্স সেলস।'

আর পোশাক-আশাক কিনতে হলে ব্যাংকক হল সোনার খনি। রাস্তার উপর ছোট ছোট স্টলে, আমাদের গড়িয়াহাট বা নিউমার্কেটের ফুটপাথের মতো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ঝাঁ চকচকে ফ্যাশন দুরস্ত পোশাক। এবং তা বাজেটের মধ্যে। ব্যাংকক গেলে শপিং হল অন্যতম ট্যুরিস্ট আকর্ষণ। তবে হ্যাঁ একটু বুঝে শুনে শপিং করবেন। রঙের মেলায় অত্যাধুনিক পোশাকের ডিজাইনের ছটায়, ভুল করে যেটা আপনার পরার নয়,

তা কিনে ফেলবেন না। এখানে মেয়েরা খোলা মেলা পোশাক পরে যেমন অবাধে ঘুরতে পারে, আমরা পারি কি?

যাকগে শপিং তো হল। এবার আসি পাটায়া ভ্রমণে। দারুণ বিচ। পরিষ্কার ঝকঝকে। অথচ লোকের ভীড় কী, আর কতরকম বিচ ওয়্যার। সুইমস্যুট, বিকিনি, শর্টস, জাম্প স্যুটস, হল্টার, স্প্যাগেটি! ছেলেদেরও দেখে কেমন যেন এই জিম থেকে বেরলো বলে মনে হয়। পেশি টানটান।

এই বিচ সিটির নৈশ আকর্ষণ এখানকার বার ও নাইটক্লাব। আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম একটি নাইটক্লাবে। গ্যালাক্সি, যেখানে রুশি মেয়েরা 'স্ট্রিপটিজ' করে। অসাধারণ ফিগার, অনবদ্য তাদের বডি মুভমেন্ট, আর খেপে খেপে নিরাভরণ হয়ে ওঠা। সেই সঙ্গে নারী-পুরুষ সবার চোখে বিস্ময়। আমি তো ওদের নাচ দেখার চেয়ে বেশি দেখছিলাম দর্শকদের ভঙ্গিমা, তাদের মুখের ভিন্ন ভিন্ন ভাব, অনুভূতি।

আরেকটা বার-এ গিয়েছিলাম সেখানে হচ্ছিল পোল ডান্সিং। এই প্রথম সিনেমার বাইরে দেখা এই ধরনের নাচ।

এই শহরে মানুষ রাতে ঘুমোয় না। ম্যাসাজ পার্লার, স্পা সব প্রায় সারা রাত খোলা। আর রাস্তায়ও ভীড়। ছোট ছোট ঠেলাগাড়িতে বিক্রি হচ্ছে এখানকার ফাস্টফুড। তা যেমন চিংড়ি বা কাঁকড়া, তেমনই হতে পারে বিভিন্ন পোকা ভাজা, ব্যাং, অক্টোপাস, ঝিনুক, শামুক, গুগলি। এই শহরে খেতে হলে, খাওয়া এনজয় করতে হলে, মন ও জিভ শক্ত হতে হবে।

তবে পটায়া থেকে কোরাল দ্বীপ অবধি নৌকো জার্নিটাও দারুণ। দুলতে দুলতে লাফাতে লাফাতে যায় সে নৌকো। মেলায় নাগরদোলা কাম পাইরেটশিপ চড়ার মতো। মনে হয় একসঙ্গে একাধিক রাইড নিচ্ছি। কোরাল আইল্যান্ড-এ দেখা যায় পলার সার।

আর এখানকার ওয়াটার স্পোর্টস বা জলক্রীড়ার সরঞ্জাম তুলনাহীন। রাফটিং, মোটর বোটস, ওয়াটার বাইকস, গ্লাইডিং, সার্ফিং, কী নেই এখানে। জল, সমুদ্র যাদের পছন্দ তাদের জন্য পাটায়া স্বর্গ। ভারতীয় ত্বক এখানে খুব সহজে পুড়ে যায়। ট্যান হয়ে যায়। সঠিক সানস্ক্রিন সঙ্গে রাখা জরুরি। কিন্তু এখানকার

মানুষের স্কিন কেমন ঝকঝকে। কোথাও নেই মলিনতা! কে জানে কী করে এরা।

ব্যাংককে আমরা সবাই মিলে মজা করেছি ঠিকই। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে বেগ পেতে হয়েছিল প্রথম প্রথম। যেমন খাবার খেতে বসে থাই খাবারের মেনু দেখে কিছুই বুঝি না। অবশেষে অনেক বুঝে শুনে কথা বলে যখন খাবার এলো তখন তাতে কালো সুতোর মতো কী সব দেখে আর খেতে পারলাম না। সেই বাঙালি চাও, চিকেন, হট-সাওয়ার স্যুপ, টম ইয়ং স্যুপই খেয়ে ফেললাম। আর যারা খুব শুচিবায়ুগ্রস্ত তারা খেল সেদ্ধ ভাত ও সেদ্ধ সবজি।

ব্যাংকক বেড়াতে হলে মন কিন্তু খোলা রাখবেন। এটা খাব না, ওখানে যাব না, ভাবলে চলবে না। পাটায়ায় যেমন বোট রাইড বা নৌকো বিহার ভাল লেগেছিল, তেমনই সুন্দর লেগেছিল ওখানকার বুদ্ধ মন্দির। একেবারে ঝকঝকে তকতকে, রুচি সম্পন্ন মন্দির। শান্ত পরিবেশ। বাইরে এত রকম আকর্ষণ, অথচ মন্দিরে খুঁজে পাবেন শান্তি।

ব্যাংককে যেহেতু সেক্সট্যুরিজম খুব খোলাখুলিভাবে পণ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাই যারা যাচ্ছেন বেড়াতে তারা মন শক্ত করে যাবেন। ভয় পাবেন না। স্ট্রিপটিজ, ম্যাসাজ পার্লার বা নাইট ক্লাব না গিয়েও মজা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি কোনও যৌন আনন্দর জন্য বলে, ভয় পাবেন না, প্রত্যাখান করবেন ভদ্রভাবে। কেউ জোরাজুরি করবে না।

ক থা ও কা হি নি ৫

সোনা মন

প্রী তি ক ণা পা ল রা য়

রথের দিন মাটি পড়েছিল কাঠামোয়। আর সেদিনই সে এসেছিল। বুনো চেহারা। চৌকো মুখ। দৃষ্টি কাউকে ছোঁয় না। মাথা ভর্তি অগোছালো চুল অবহেলায় নেমেছে ঘাড় অবধি। এ বয়সি ছেলেকে ধুতি পরতে আজকাল দেখা যায় না। কিন্তু ওর পরণে ধুতি আর গোধূলি রঙের ফতুয়া। ছাদের চৌখুপি থেকে চোখ জোড়া দেখতে পেয়েছিল আর খাতার ওপর পেন মুহূর্তে স্থির! অজান্তেই শরীর ঝুঁকেছিল আরও খানিকটা। আর আশ্চর্য সোঁদা গন্ধটা ঠিক তখনই ছাদ অবধি পৌঁছেছিল। পশ্চিমকোণে ইঁট গাঁথা উঁচু ধাপের প্রিয় জায়গাটা ছেড়ে উঠে শ্বাস টেনেছিল মন নাভি অবধি। গন্ধটা শরীরে ছড়িয়েছিল। আপনা হতেই চোখ নেমে গিয়েছিল আবার উঠোনে। কে ও?

মেজ জেঠি, ন'কাকি, ছোট পিসির কলকল শব্দে ঘোর কাটে। পিতলের ঘটিতে জল হাতে জেঠি, ন'কাকির হাতে তালপাতার পাখা, পিছন পিছন আসা পিসির হাতে কাঁসার রেকাবিতে মিষ্টি, গ্লাসে জল। হরিজেঠুকে যেন এতক্ষণে দেখতে পেল মন। উভয় তরফের কুশল বিনিময়ের পর মেজ জেঠি ঘটির জল দিয়ে হরিজেঠুর পা ধুইয়ে মুছে দেয় আঁচল দিয়ে। সঙ্কুচিত হরিজেঠু প্রতিবারের মতো এবারও বলে ওঠে 'থাক, থাক মা। একি আমায় শোভা পায়!' ন'কাকি ততক্ষণে আলগোছে পাখার বাতাস দিচ্ছে। হরিজেঠু ওকেও বলে, 'থাক মা, হয়েছে।' এ বাড়ির রীতি এটা। ছোট থেকে দেখে আসছে মন। রথের দিন হরিজেঠু আসবে দেশের বাড়ি থেকে। তার অপেক্ষায় সকাল থেকে তোড়জোড়। মা দুগ্গা আর তাঁর বাহিনীর কাঠামোও ঠিক হরিজেঠুর জন্য অপেক্ষা করে? আগের দিন রাতে জেঠু মাটি এনে রাখে। অত্যন্ত সযত্নে সে মাটি রাখা হয় ঠাকুর দালানের এক কোণে। কিন্তু কখনওই দোতলার ঠাকুর ঘরে নয়। মনরা যখন ছোট, পুজো, রথ যে কোনও উপলক্ষেই সমান উত্তেজিত, কড়া শাসন থাকত, ওই মাটিতে যেন

হাত না লাগে। মন একবার বলেছিল, 'পুজোর জিনিস যখন পুজোর ঘরে রাখলেই হয়।' জেঠি বলেছিল, 'হয় না।' মন জানতে চেয়েছিল, 'কেন?' কয়েক মুহূর্ত মনের চোখের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে জেঠি জানিয়েছিল, 'তুমি বুঝবে না।'

অনেক কিছুই বোঝে না মন। সেই ছোট থেকেই মনের না বোঝা নিয়ে অশান্তি এ বাড়ির ভীষণ চেনা ছবি। মা মরা মেয়ে বলে সকলে ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছিল অনেক বছর। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। সত্যি বলতে, মনও আজকাল কারও কাছে তেমন বুঝতে চায় না। বোঝাপড়াটা বহুদিনই বন্দী হয়েছে খাতা-পেন-কালো অক্ষরদের ঘেরাটোপে। এর মধ্যে মেজ জেঠু বেরিয়ে এসেছে, 'তোমার সঙ্গে ওটি কে হরি?' হরিজেঠু সামান্য বিব্রত মুখে জানায়, 'আজ্ঞে কত্তা, আমার ভাইপো, সোনা। আমার সঙ্গে হাত পাকাচ্ছে। এবার নিয়ে এলাম।' জেঠু অবাক, 'বলো কী? পড়াশোনা?' হরিজেঠু বিব্রত, 'করছিল কত্তা। ভর্তি করেছিলাম কলেজে। ছেড়ে দিয়েছে গেল বছর। বলে ভাল লাগে না।' মেজ জেঠু অসন্তুষ্ট মুখে বলে, 'ভাল লাগে কী?' হরিজেঠু জানায়, 'সারাদিন মাটি ঘাঁটে, পাগল ছেলে। তবে হাতখানা বড় ভাল কত্তা। ঈশ্বরের দান।' মন দেখল আর কথা না বাড়িয়ে জেঠু বলল, 'চলো, মিষ্টি-জলটা খেয়ে চলে এসো দালানে। শুভক্ষণ সমাগত।' জেঠু ভেতরে চলে গেল। জেঠি, কাকিরা তোড়জোরে ব্যস্ত। হরিজেঠু মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিল তার দিকে। মন দেখল, সে মাথা নাড়ল, খাবে না। খাতার পাতারা ঝোড়ো বাতাসে ফৎ ফৎ করে ওঠায় মন চমকে ফিরেছিল। আষাঢ়ের মেঘ জলভার সামলাতে না পেরে হঠাৎ পশলা ঝরায়। বড় বড় ফোঁটা থেমে থেমে পড়তে থাকে খাতায়। মন দৌড়ে কাছে গিয়ে দ্যাখে ভিজে যাচ্ছে অসমাপ্ত শব্দরা।

ভালবাসা শহরে আসে, শরীরে আসে
ভালবাসা, বৃষ্টি নামায়, মন ভাসে...

সোঁদা গন্ধটা ততক্ষণে ছাদে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভেজা বাতাসে, বৃষ্টি আর সোঁদা গন্ধের একটা পুরুষালি ককটেল। মন আবার শ্বাস টানে।

বিকেলের মধ্যে যাবতীয় কর্মকাণ্ড শেষ। এসব কাজে মনকে কেউ ডাকে না। ছাদ থেকে নেমেছিল যখন ন'কাকি নির্বিকার গলায় একবার বলেছিল, 'ইচ্ছে হলে ঠাকুর দালানে এসো, বছরকার দিন।' মনের ইচ্ছে হয়নি। ঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছিল। কী জানি কেন, সারাদিন আর বেরোতে মন চায়নি। দুপুরে খাবার ডাক পড়েছিল। মন সাড়া দেয়নি। এসবে অভ্যস্ত পরিজন খাবার টেবিলে ঢাকা রেখে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়েছিল। সন্ধেবেলা যখন দালানে আরতি হচ্ছে কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখের ঐশ্বরিক শব্দ অনুষঙ্গ আশপাশ ভারী করে তুলছে, মনের খুব খিদে পেল। পায়ে পায়ে নিচে নেমে খাবার ঘরে ঢুকে খাবার খেতে বসল মন। ভরসন্ধেবেলা সন্ধ্যারতির সময় মনকে ওভাবে গোগ্রাসে ভাত খেতে দেখে বিরক্ত ন'কাকি বলেছিল, 'দিনক্ষণটুকুও কি মানা যায় না?' মনের দিন নেই। ক্ষণ আছে। ক্ষণ নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট আছে। কিন্তু সেসব কাকিকে বলা জরুরি মনে হল না মনের। খাওয়া শেষে আবার সিঁড়ির পথই ধরেছিল, কিন্তু পা ধরে কে যেন টান মারল। অবাক হয়ে মন দেখল, ও ঠাকুর দালানের দিকে এগোচ্ছে।

মন ছাড়া বাড়ির সবাই সেখানে। উঁকি দিয়ে পরিবেশটা দেখে খারাপ লাগল না। জেঠু আরতি করছে। ন'কাকি শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। জেঠি দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে। রন্টু মহা উৎসাহে কাঁসর বাজাচ্ছে। মনের চোখ ঘুরতে থাকে। আর কাউকে খুঁজছে ও? না, কেউ নেই! খটকা নিয়ে ফিরছিল, চোখ পড়ল খিড়কির দিকে। দরজা

খোলা। পাশে বাঁধানো পুকুর ঘাট আর বাগান। নামেই বাগান। তেমন দেখাশোনা কেউ করে না। আম, কাঁঠাল, বাতাবি, করমচার গাছ শরণার্থীর মতো বাস করে। এক মনই মাঝে মাঝে কথা বলতে যায় ওদের সঙ্গে। দরজা খোলা দেখে মনের কপালে তাই ভাঁজ। অন্ধকার বাগানে কেউ নেই। ঝিঁ ঝিঁ আর নিস্তব্ধতার শব্দ কোলাজ শুধু। অন্ধকার মনের বড় প্রিয়। সারাদিন ঘরবন্দী থাকায় ঘাটটা ওকে টানল। সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে চমকে উঠল মন একটা আবছা চেহারা ঘাটের একদম নিচের সিঁড়িতে বসে। আকাশের দিকে মুখ। ওই তো ও। সবে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। আকাশ অন্ধকার। কী দেখছে ও আকাশে? কী করবে বুঝতে পারে না মন। তার প্রিয় জায়গাটা দখল করে যে বসে তাকেই কি খুঁজছিল ও? কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে ফিরে যাওয়াই যখন মনস্থির করেছে অমনি একটা রাতপেঁচা অসময়ে ডেকে উঠল কর্কশ কণ্ঠে। চমকে ফিরেছে চেহারাটা শব্দ লক্ষ করে। আর ফিরেই দেখেছে মনকে। কী যে হল, মন নড়তে পারল না।

সন্ধে থেকেই টিপটিপ পড়ছিল। রাতে জোরদার হল বৃষ্টি। জানলার ধারে বসেছিল মন। বৃষ্টি বরাবর ওকে এলোমেলো করে যায়। আজ অকারণ একটা কষ্ট ঠেলা মেরে চলেছে নাভি থেকে আলজিভ অবধি। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বারবার। ছিটকে আসা বৃষ্টির জল জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভেজায়। এই কষ্টটাকে বড় ভয় পায় মন। উৎসবের গন্ধ পেলেই এ কষ্ট ঘিরে ধরে ওকে। মনের বাঁচার উপায় থাকে না। কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল খেয়াল নেই। তন্দ্রা ভাঙে একটা সুরেলা শব্দে। বৃষ্টি ছাপিয়ে সুর ঘুরছে বাইরে। সজাগ হল কান। বাঁশির শব্দ না নিশির ডাক? বৃষ্টি আর সারাদিনের ক্লান্তি এ বাড়ির মানুষগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। শব্দ অনুসরণ করে মন এগোতে থাকে। বারান্দা, উঠোন পার হয়েও সুরের উৎস মুখ খুঁজে পায় না। কিন্তু শরীর আনচান করা বাঁশির শব্দ ক্রমশ উন্মত্ত করে তোলে ওকে। সুরে এমন নেশা হয় নাকি? অসহায় মন অগত্যা বৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে। ভূতগ্রস্তের মত ভিজতে থাকে বাঁশির ছন্দে। সুর কখন থেমে গেছে। কতক্ষণ ভিজেছে জানে না মন, শরীর শিথিল হয়ে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে প্রায় কে যেন আঁকড়ে ধরে ওকে। মন তার দুহাতের ঘেরাটোপে, বুনো গন্ধে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ওর। মন কি সংজ্ঞা হারাচ্ছে?

২

সাতদিন ধরে জ্বর নামছে না। উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে জিভও। তালু থেকে বিকিরিত হচ্ছে বিজাতীয় উত্তাপ। চোখের পাতা ভারী। শরীর অবশ। জোর করে সরাতে গিয়ে কীসে যেন পা ঠেকল। চোখ বন্ধ করেই মন মৃদু ডাকল, 'পালক'। নড়ে উঠল শরীরটা। মন আবার আলতো ডাকে এবার গুটিসুটি ছেড়ে পালক উঠে আসে পাশে। পরিচিত ছোঁয়া পেয়ে অভিমানী মিউ মিউ ডাকে উদ্বেগও প্রকাশ করে। মন জোর করে হেসে কাছে টানে ওকে। বালিশের পাশে লেখার খাতা। ক্লান্ত চোখে একবার দেখে। বৃষ্টিতে তো কতই ভিজেছে কিন্তু এভাবে উত্তাপ কখনও কাবু করেনি। অন্যমনস্ক হাতে খাতা টেনে পাতা ওলটাতে থাকে। ... অসমাপ্ত লাইন দুটোয় চোখ পড়ে। তারপরই তো সব এলোমেলো হয়ে গেল। কতক্ষণ বেহুঁশ ছিল জানে না মন কিন্তু যতক্ষণ ছিল বোধহয় ওই বুকেই ছিল। চোখ খুলতে দুটো নরম চোখের উদ্বেগ দেখে আর চোখ বন্ধ হয়নি। আর আশ্চর্য! কেউ কোনও কথা না বলে ওভাবেই থেকে গিয়েছিল আরও কয়েক মুহূর্ত। কীভাবে! ওই সময় কি ঈশ্বর নেমেছিল? বাঁশির সুরে ঈশ্বর নামে না? শুধু কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খের শব্দেই কি ঈশ্বর প্রভাবিত হয়? মন বিশ্বাস করে না!

এ বাড়ির বিশ্বাস অবশ্য তাই। যথার্থই বারো মাসে তেরো পার্বণ এ বাড়িতে। কীভাবে সেদিন ঘরে ফিরেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয় মনের। ঘরে এসে এক এক করে ভিজে জামা শরীর থেকে সরাচ্ছিল যখন তীব্র বিদ্যুৎ চমকেছিল বাইরে। সেই সঙ্গে শব্দ ব্রহ্ম। সে আলোয় নিজের শরীরকে অচেনা ঠেকেছিল সেই মুহূর্তে। পরদিন ঘুম ভাঙতে আকণ্ঠ এক টান ওকে নিয়ে গিয়েছিল ঠাকুর দালানে। আশ্চর্য! দালান ফাঁকা! উঁহু ফাঁকা নয়, খাঁ খাঁ! পেনটা কখন টেনে নিয়েছে কে জানে। মন দেখছে ও এখন উপুর হয়ে ঝুঁকে রয়েছে খাতার ওপর। পালক ঘুমোচ্ছে পাশে। মনের পেন শব্দ জড়ো করে—

ভালবাসা শহর ছাড়লে জ্বর আসে
ভালবাসা পালক হয়ে পাশে আসে।।

৩

বিশ্বকর্মা পুজোর পরদিন সকাল। বাড়ির সামনের প্যান্ডেলে পাড়ার ছেলেদের আমোদের প্রকাশ তখনও অব্যাহত। তীব্র স্বরে মাইক চলছে। সেই সঙ্গে রাতের খিচুড়ি পার্টির শলা পরামর্শ। ঘরে বসেই সব শুনতে পাচ্ছে মন। দুর্বল হলেও শরীর এখন অনেক সুস্থ। বাবা এসেছে তিনদিনের ছুটিতে। মনের শরীর দেখে বাবার মুখে যে ব্যথার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল বসে বসে সে কথা ভাবছিল মন। এ মানুষটা তার রোজকার জীবনের খোঁজ রাখে না কিন্তু অসুস্থতায় কষ্ট পায়। কেন? শুধুই রক্তের সম্পর্কের কারণে? মনের যে আরও অনেক রকমের অসুস্থতা আছে সে কথা বাবা জানে? গতকাল হরিজেঠু আবার এসেছে। গলা পেয়েই দৌড়েছিল মন! কিন্তু হরিজেঠু একা। বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। এবার একটা বারোয়ারির মন্ডপে প্রতিমা গড়ার অর্ডার পেয়েছে। নিতে চায়নি কাজটা। জবরদস্তি করায় বাধ্য হয়েছে। আসতে তাই কদিন দেরি হল। তবে কি সে সেখানেই? মন ফিরে এসেছিল ঘরে। কদিন আর বেরোয়নি!

একটু একটু করে বাঙ্ময় হচ্ছেন দেব-দেবীরা। হরিজেঠু রাতদিন ওঁদের শরীরে ডুবে। নিখুঁত শরীর গড়তে হবে। দেবদেবীদের শরীরে খুঁত থাকে না। এমনকী বাহনরাও সেই অ্যাডভান্টেজ পায়। হরিজেঠু সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। ইঁদুর থেকে সাপ সবাই ওঁর যত্নে নধর। মনের বেশ মজা লাগে। যতই দেবদেবী হন, পড়েছেন মানুষের হাতে। সুতরাং তার আকাঙ্খিত রূপেই প্রকাশিত হতে হবে, তবে 'থিম'-এর ছোঁওয়া মৃৎশিল্পী হরিচরণ পালকে ছোঁয়নি। তিনি এখনও দেবীর সাবেকি রূপেই বিশ্বাসী। জটাজুট সমাযুক্তা, মস্তকে অর্ধচন্দ্র, আনন পূর্ণচন্দ্রতুল্য ও ত্রিনয়ন বিশিষ্ট, বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়। হতে পারেন মা কিন্তু তিনি বরাবরের নবযৌবনসম্পন্না সুচারুদর্শনা সর্বাভরণভূষিতা ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানা পীনোন্নত পয়োধরা মহিষাসুরমর্দিনী! বাহন সিংহের ওপর দেবীর দক্ষিণ পদন্যস্ত, কিছু উর্দ্ধে মহিষের উপর দেবীর বাম অঙ্গুষ্ঠ ন্যস্ত। অন্য দেবীদের মত শুধুমাত্র আশীর্বাদকের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকলে কী হত জানে না, তবে অমন নিখুঁত সেজেও এরকম অ্যাকশনে ব্যস্ত বলেই এই ভঙ্গীকে মনের বেশ সেক্সি লাগে। পুজোর পাঁচদিনের চেয়ে এসময়টা মনের বরাবর প্রিয়। অন্য অন্য বার হরিজেঠুর সঙ্গে অনেক গল্প হয়। হরিজেঠু ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই লক্ষ্মী, সরস্বতীর ঠোঁট, চিবুক, কণ্ঠ গড়তে থাকেন। দক্ষ আঙুলের ছোঁওয়ায় দুরন্ত হয়ে ওঠে শরীরের এসব প্রতঙ্গ। এবার ঠাকুর দালানের দিকে

ঘেঁষেছিল মন একবারেই। আজ হঠাৎ একটা অস্থির দুপুর ওকে দালানে টেনে আনল বিকেলে। হরিজেঠু দেখেই একগাল হাসলেন, 'দিদিমণি! কোথায় ছিলে এতদিন? আসোনি কেন? আমি তো রোজ তোমার কথা ভাবি!' মন উত্তর দেয় না। রোজ কারও কথা ভাবলেই যে সে আসবে পৃথিবীতে এমন কোনও নিয়ম নেই! হরিজেঠু কাজের ফাঁকে সারা বছরের গল্প জুড়ে বসেছে, মন সে গল্প থেকেই আনুষঙ্গিক চিত্রকল্প গড়ে তোলে। কথা থামিয়ে হরিজেঠু যে অনেকক্ষণ তাকে দেখছে তা খেয়ালই করে না। মেয়েটা পাগল হরিজেঠু জানে। কিন্তু কত পাগল জানে না।

দিন দশ বাদে দ্বিতীয় দফার প্রলেপ পরার পর এবার প্রতিমা শুকোতে হবে কদিন। হরিজেঠুর এসময় কাজ কম থাকে। অন্যবার এখানেই অলস দিন কাটায়। এবার বারোয়ারি মন্ডপের কাজ থাকায় আবার চলে গেল কদিনের জন্য। পুজোর গন্ধ এখন আরও ঘন। আকাশ বাতাস নিজস্ব সুরে আগমনী গাইছে। পালকের সঙ্গে ছাদে ঘুরছিল মন। আর গন্ধ নিচ্ছিল পুজোর। ঈশ্বর আসলে কী? ওই পাঁচদিন যে নিয়মমত পুজো হয় ঠাকুর দালানে ঈশ্বর কি তখন হরিজেঠুর গড়া মূর্তির মধ্যে এসে ঢুকে পড়েন? নাকি ঈশ্বর থাকে এই আকাশে, এই বাতাসে মুক্তির আলোয় আলোয়? ঈশ্বরের কি সত্যি তেত্রিশ কোটি রূপ আছে? নাকি ঈশ্বর এক বায়বীয় পাওয়ার হাউস? মাঝে মাঝে ভাবে মন

মন যতদিনে লালন করে ওই চুপকথা, ততদিনে ঈশ্বরের শরীরকে প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছে সোনা। তীব্র মাধ্যাকর্ষণে মন ঘর ছাড়া! সারাদিন ঘুরে বেড়ায় বাগানে, সদরে, দালানে কিন্তু টের পায় হুঁশে নেই সে। জেঠির কথায় সকালে জল খাবার পৌঁছতে গিয়েছিল একদিন, সন্ধেবেলা গিয়ে দেখেছে তেমনই পড়ে আছে। আর বিভোর হয়ে সে তাকিয়ে আছে তার সৃষ্টির দিকে। কে যে কার সৃষ্টি! মন দেখতে থাকে কিন্তু মনের অস্তিত্ব টেরই পায় না সে।

অকারণ অভিমানে পরদিন সকাল থেকে নিচে নামেনি মন। সারাদিন ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারি আর পালকের সঙ্গে সময় কাটানোর পর সন্ধেবেলা আর পারল না। ঘাটে গিয়ে বসে থাকবে ভেবে বেরল ঘর থেকে। দালান পেরিয়ে খিড়কির দিকে এগোতে গিয়ে না চাইতেও চোখ গেল প্রতিমার দিকে। সে নিশ্চয় এখনও সৃষ্টির আনন্দে বিভোর! কই না তো! ঠাকুর দালান তো ফাঁকা? প্রজ্বলিত প্রদীপ শুধুমাত্র মা দুর্গাকে সঙ্গ দিচ্ছে। আচমকা চোরা একটা ভয় চেপে ধরল মনকে। তবে কি কাজ শেষ, তাই সে চলে গেল?

বাগান, পুকুরঘাট এমনকী সদরের বাইরেও তন্নতন্ন করে খুঁজে এল মন। না, নেই। কোথাও নেই। আগমনী মুহূর্তে হাহাকার রাগ শোনায়। মুচড়ে ওঠা যন্ত্রণা চেপে ধরে, দালানে বসে পড়ে মন। নৈঃশব্দের বার্তা ঈশ্বরও বুঝল না?

জেঠির কথায় সকালে জল খাবার পৌঁছতে গিয়েছিল একদিন, সন্ধেবেলা গিয়ে দেখেছে তেমনই পড়ে আছে। আর বিভোর হয়ে সে তাকিয়ে আছে তার সৃষ্টির দিকে। কে যে কার সৃষ্টি! মন দেখতে থাকে কিন্তু মনের অস্তিত্ব টেরই পায় না সে।

আকাশচুম্বী অট্টালিকার ছাদে উঠে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে ওই বায়বীয় অস্তিত্ব? উড়ো জাহাজে চড়ে হতে পারে না এটা! উড়োজাহাজ চলমান। ঈশ্বরকে ছুঁতে গেলে স্থির হতে হয়। এই মুহূর্তে মন স্থির হতেই চায়!

হঠাৎ মেজজেঠির কথা ভেসে আসে, 'ওমা, সে কী কাণ্ড। কী হবে এখন?' প্রশ্নের উত্তর শোনা যায় না। মেজ জেঠির হাহুতাশ উদ্বেগ বাড়তে থাকে। যোগ দেয় ন'কাকি, ছোটপিসি। প্রশ্নের কোরাস। কিন্তু উল্টো দিকে কোনও সাড়া নেই। কৌতূহলে মন আসে ছাদের ধারে আর ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক। সম্মিলিত উদ্বেগকে শান্ত স্বর ততক্ষণে জানাচ্ছে, এখান থেকে যাওয়ার পরদিনই জেঠা জ্বরে পড়ে। বারোয়ারি মন্ডপের প্রতিমার কাজ কোনোমতে শেষ করেছে কিন্তু গত দুদিন বিছানা থেকে আর উঠতে পারেনি। দুপুর থেকে জ্বর আসছে সন্ধের আগে ছাড়ছে না। দুশ্চিন্তায় জেঠা তাকে পাঠিয়েছে। প্রতিমার অসমাপ্ত কাজ সে করবে। মেজ জেঠি তবু শান্ত হয় না, 'তুমি একফোঁটা ছেলে, তুমি পারবে?' মাথা নাড়ে জেঠার সোনা, পারবে! এরপরই সরাসরি ছাদের দিকে তাকায়, যেন টের পেয়েছে কে তাকে দেখছে। মন মুহূর্তে অপ্রস্তুত। কিন্তু ধরা পরার পর তো কিছু করার থাকে না। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নেয় সে। কিন্তু মন ততক্ষণে পড়ে ফেলেছে বৃষ্টি-বাঁশির সম্মোহনী সুর্মা ওই চোখেও লেগে রয়েছে।

এখন অনেক রাত। একা ঠাকুর দালানে বসেছিল মন। সামনে সুসজ্জিতা দেবী। প্রদীপের আলোয় বেশ শান্ত দেখাচ্ছে এখন। অজান্তেই মনের চোখে বৃষ্টি নামে। অপূর্ব সাজিয়ে গেছে সোনা দেবী মূর্তিকে। চোখের জল চিবুক ছোঁয় মনের, আমাকে কেউ সাজাবে না? খুব ইচ্ছে হল দেবীমূর্তিকে ছুঁয়ে দেখার। ওঁর সারা শরীরে তো তার ছোঁওয়া। মনও একটু ছুঁয়ে দেখবে। হোক না মাধ্যম ঈশ্বর! এগোতে গিয়েও একবার থমকায়। পরিশুদ্ধ বস্ত্র ছাড়া ঈশ্বরকে ছোঁওয়া বারণ। কেউ দেখে ফেললে হইহই বেঁধে যাবে। কিন্তু মনকে যে এখন ছুঁতেই হবে। পেতেই হবে তার স্পর্শ। নিতেই হবে তীব্র বুনো পুরুষকার-এর আঘ্রাণ।

সম্মোহিতের মত এগোতে থাকে মন। এগোতেই থাকে। সামান্য কয়েক পা। মনে হয় যেন পথ অনন্ত। আজ ঈশ্বর এখানে বাসা বেঁধেছেন। মন নিশ্চিত। মন টের পাচ্ছে। মন এগোয়। প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে এসময় হ্যাঁচকা টান। শরীরে যেন সেই বিদ্যুৎ, শব্দব্রহ্ম ছাড়াই। ছিটকে এসে মন পড়ে তার বুকে। বুনো শরীরটা জাপটে ধরেছে পিছন থেকে। শ্বাস চলাচল বন্ধ কয়েক মুহূর্ত। চোখ বন্ধ করেই টের পায় মন ঈশ্বর এসেছেন! বাঁধন শক্ত হতে থাকে ক্রমশ। মন কি আবার সংজ্ঞা হারাবে? মন কি এখন ঈশ্বরের খুব কাছে? তিরতির করে কাঁপতে থাকে ঠোঁট। চোখ মেলার সাহস নেই। শুধু বুঝতে পারে ঈশ্বরের ঠোঁট জোড়া নেমে এসেছে ওর ঠোঁটে।

ভূ ত ভ বি ষ্য ৎ

রাশিফল। আশ্বিন, কার্তিক মাস কেমন যাবে তার আগাম কিছু আভাস দিচ্ছেন শ্রীভৃগু (অনাদি)

মেষরাশি

এই রাশির জাতক/জাতিকাদের আনন্দের মধ্যে দিয়ে মাসটা শুরু হলেও শেষের দিকে মানসিক বিষণ্ণতা। চলা ফেরা এবং খাওয়ার প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা মনসংযোগের অভাব ঘটবে। শুভ রঙ : একাধিক রঙ মিশ্রিত পোশাক ; অশুভ রঙ : একমাত্র কালো চলবে না ; শুভ সংখ্যা ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ খাবার : রুটি, ডাল, আনারস, পোস্ত ; অশুভ খাবার : শাক, মুসুর ডাল, কাঁচা টমেটো ; শুভ বার : সোম ; অশুভ বার : শনি।

বৃষরাশি

বাড়িতে আত্মীয় সমাগম, ব্যয় ভার বৃদ্ধি, তবে আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটবে সময়। স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ, বিশেষভাবে প্রসাধনী বিউটিপার্লার, রেস্টুরেন্ট ও জল জাতীয় ব্যবসায় লাভ হবে। শুভ রঙ : সাদা ; অশুভ রঙ : নীল ; শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা ৪ ; শুভ খাবার : ভাত, মাছ, শসা ; অশুভ খাবার : মাছের ডিম, ফুলকপি, গাজর ; শুভ বার : শনি ; অশুভ বার : মঙ্গল।

মিথুন রাশি

নতুন বন্ধু লাভ, বিদেশ যাত্রা যোগের সম্ভাবনা, হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি, শিল্প ও সাহিত্য চর্চায় যুক্ত জাতক/জাতিকারা লাভবান হবেন। চলাফেরার ক্ষেত্রে সাবধান, কারণ আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। শুভ রঙ : সাদা, সবুজ মিশ্রিত ; অশুভ রঙ : গোলাপি, ধূসর ; শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ খাবার : রুটি, আটার লুচি, চিকেন, পেঁয়াজ ; অশুভ খাবার : চিংড়িমাছ, ইলিশ মাছ, কচুর শাক ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : রবি ;

কর্কট রাশি

স্বাধীন কর্মে যুক্ত যাঁরা তাদের জন্য শুভ। একাধিক স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। যৌথভাবে ব্যবসায় মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে, একক কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ফল কিছুটা খারাপ হতে পারে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা। শুভ রঙ : আকাশি ; অশুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ সংখ্যা : ৭ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ খাবার : আমিষ, তবে মাছের মাথা, ল্যাজা বাদ ; অশুভ খাবার : টক, বাঁধাকপি ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : মঙ্গল।

সিংহ রাশি

কোনও বাড়তি দায়িত্ব বা ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। দূর ভ্রমণে শুভ।
বিদেশি বন্ধুলাভ। একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। নতুন ভাবে অর্থ লগ্নী অনুচিত। শুভ রঙ : বেগুনি ; অশুভ রঙ : গোলাপি ; শুভ সংখ্যা : ৮ ;
অশুভ সংখ্যা : ২ ; শুভ খাবার : মোচা, চিংড়িমাছ, ছোলার ডাল ; অশুভ খাবার : মুসুর ডাল, বিট, গাজর, ডিম ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : বুধ।

কন্যা রাশি

অনেক ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে।
অবশেষে সাফল্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির যোগ আছে। নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আত্মবিশ্বাস থাকলে ভাল হবে। শুভ রঙ : সাদা, কালো ; অশুভ রঙ : সবুজ, মেরুন ; শুভ খাবার : বেগুন, পোস্ত, মাছ ; অশুভ খাবার : মিষ্টি, আটার রুটি, টক ; শুভ সংখ্যা : ৩ ; অশুভ সংখ্যা : ১ ; শুভ বার : রবি ; অশুভ বার : মঙ্গল।

তুলা রাশি

ব্যয় ভার বৃদ্ধি এবং পরিবারের কেউ বিয়োগ হওয়ার যোগ আছে। সন্তান সম্ভবার কন্যা সন্তানের ভাব শুভ। বাইরে যাওয়ার সুযোগ নষ্ট হতে পারে। ভবিষ্যতে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। শুভ রঙ : সবুজ ; অশুভ রঙ : কালো ; শুভ সংখ্যা : ৪ ; অশুভ সংখ্যা : ৯ ; শুভ খাবার : ভাত, মাছ, বাঁধাকপি, মুরগির ডিম ; অশুভ খাবার : সামুদ্রিক মাছ, বাদাম, ফুলকপি ; শুভ বার : শুক্র ; অশুভ বার : সোম।

বৃশ্চিক রাশি

আগুন, জল এবং জলপথ থেকে সাবধান। শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের লোকের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া ভাল। প্রথম মাস আনন্দে কাটবে। স্বাধীন কর্মে যুক্ত যাঁরা তাঁরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। শুভ রঙ : সাদা, হলুদ, গোলাপি ; অশুভ রঙ : কালো, আকাশি, ধূসর ; শুভ সংখ্যা : ১ ; অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ খাবার : ইলিশ মাছ, বেগুন ; শুভ বার : সোম, শুক্র ; অশুভ বার : মঙ্গল, বৃহস্পতি।

ধনু রাশি

লক্ষ স্থির রাখতে পারলে অবশেষে সাফল্য আসবে। কর্মে উন্নতি, আটকে থাকা অর্থ প্রাপ্তি, তবে প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা থেকে সাবধান। শারীরিকভাবে ক্ষতি হওয়ার যোগ আছে। ভ্রমণে শুভ পাহাড়ি এলাকা। বিয়ে স্থির হওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়। শুভ রঙ : হলুদ, কালো, সোনালি ; অশুভ রঙ : গোলাপি, নীল ; শুভ সংখ্যা : ৭, ৯ ; অশুভ সংখ্যা : ৫, ৮ ; শুভ খাবার : চিকেন বিরিয়ানি, চিলিচিকেন, টকদই ; অশুভ খাবার : মটন বিরিয়ানি, মাছের ডিম, ময়দা ; শুভ বার : সোম, বুধ, শুক্র ; অশুভ বার : মঙ্গল, শনি, রবি।

মকর রাশি

নতুনভাবে ব্যবসায় সাফল্য আসবে। একক কর্মে শুভ হবে। চাকুরিজীবিদের কিছুটা হতাশা আসতে পারে ; প্রণয় সূত্রে বিয়ের সম্ভাবনা আছে। শেয়ার বাজারে অর্থ লগ্নী করলে ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের লোকের সঙ্গে আনন্দ করলে ভাল হবে। শুভ রঙ : আকাশি, গোলাপি, ধূসর ; অশুভ রঙ : হলুদ, কালো, সবুজ ; শুভ সংখ্যা : ৫ ; অশুভ সংখ্যা : ৭ ; শুভ খাবার : ভাত, তরকারি, বেগুন, পোস্ত ; অশুভ খাবার : দই, তেঁতুল টক, মিষ্টি ; শুভ বার : রবি, বুধ ; অশুভ বার : শুক্র, মঙ্গল।

কুম্ভ রাশি

সামান্য কারণে পরিবারের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনসংযোগ-এর অভাব ঘটবে। একাধিক বন্ধু লাভের যোগ আছে। চলা ফেরায় সাবধানতা অবলম্বন করবেন। সন্তান লাভের জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শুভ রঙ : লাল, মেরুন, হলুদ ; অশুভ রঙ : নীল, গোলাপি ; শুভ সংখ্যা : ২ ; অশুভ সংখ্যা : ৪ ; শুভ খাবার : আমিষ ; অশুভ খাবার : শাক, ডিম ; শুভ বার : বৃহস্পতি ; অশুভ বার : শুক্র।

মীন রাশি

নতুনভাবে প্রেমপ্রীতি, ভালবাসার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন সৃষ্টির জন্য সম্মান বৃদ্ধি হবে। কর্মসূত্রে একাধিক জায়গায় ভ্রমণ। শুভ রঙ : সাদা, সবুজ, ঘিয়ে, বাদামি ; অশুভ রঙ : কালো, লাল ; শুভ সংখ্যা : ৪ ; অশুভ সংখ্যা : ৮ ; শুভ খাবার : মটর ডাল, ছোলার ডাল, রুটি ; অশুভ খাবার : ময়দার লুচি, মাংস, টমেটো ; শুভ বার : বুধ, শনি ; অশুভ বার : মঙ্গল।

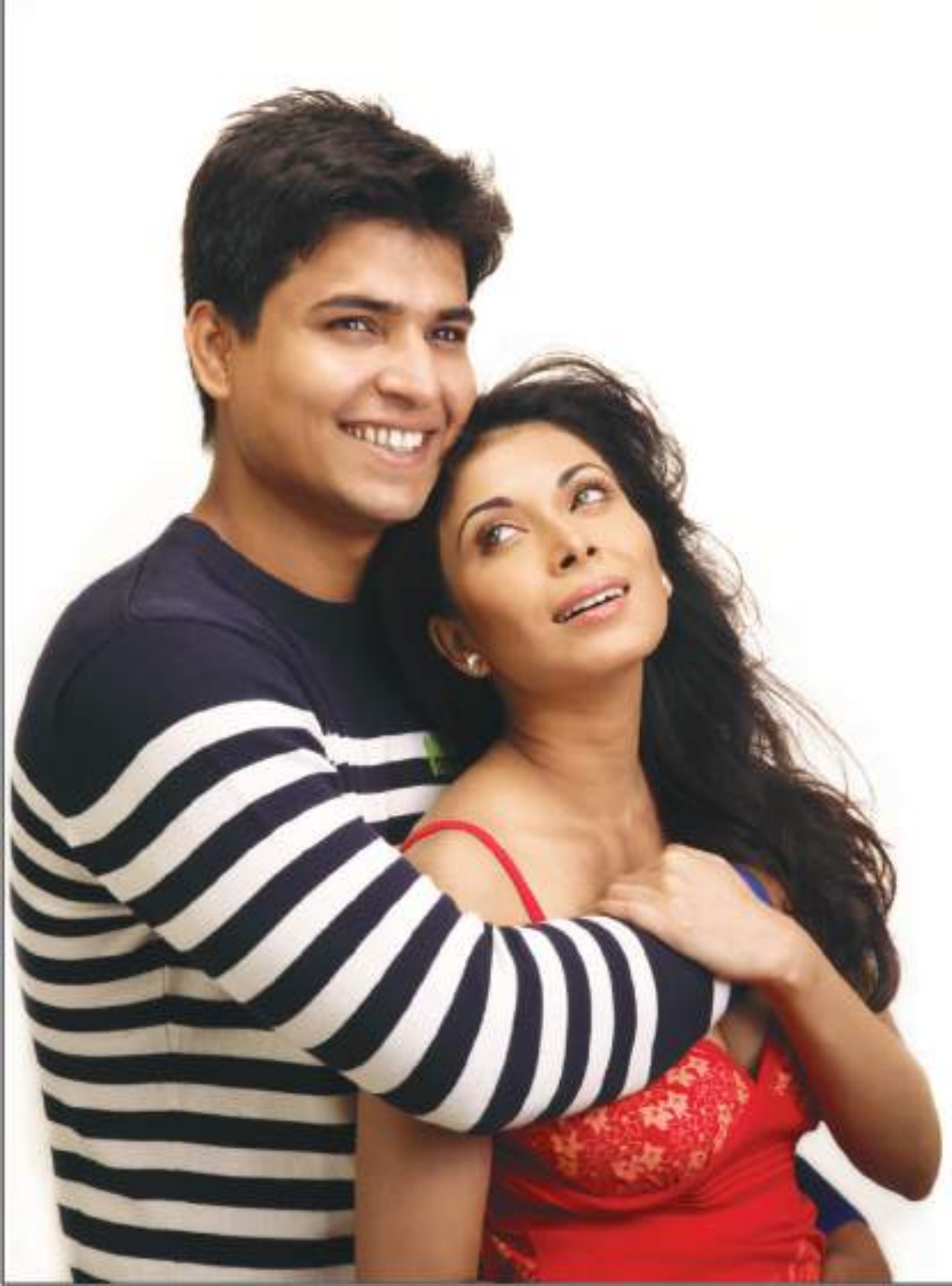

চিন্তা নয়। চাই সুখ।

Suvida® 72

আফশোস থেকে আনন্দ

এমারজেন্সি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

REWEL

A Division of
Eskag Pharma

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

RNI NO.: WBBEN/2011/39356

Suvida®

কারণ সিদ্ধান্তটা আপনার

বিশদ জানতে হলে ফোন করুন ১৮০০ ১০২ ৭৪৪৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে
অথবা মেল করুন eskagsuvida@gmail.com মেল আই ডি তে

গর্ভনিরোধক বড়ি

স্বত্বাধিকারী সুনীল কুমার আগরওয়াল কর্তৃক পি ১৯২, লেকটাউন, তৃতীয় তল, ব্লক - বি কলকাতা ৭০০০৮৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড ১৩, ১৩/১ এ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭২ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদেষ্ণা রায়।